প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিণ্টিং
১/বি গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

জনসাধারণের রুচি

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর (কবিতা)

ঈশাবাস্য দিবানিশা („)

স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যত („)

মাও ৎসে তুং-এর কবিতা

সংবাদ মূলত কাব্য

অন্বিষ্ট (কবিতা)

সেই অন্ধকার চাই („)

বছর পঁচিশ („)

সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্ক্‌সীয় কাল

বাংলা সাহিত্যে,—বৃহত্তরভাবে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইতিহাসের পথে মোড় ফেরা—অথবা বেশি-বা-কম হাওয়াবদলের ব্যাপারটা ঠিক বিশেষ দিন বা বিশেষ একটা তারিখের বিশেষ ঘটনার ছেদচিহ্নে তো নয়, বরং তার তুলনা বহমান স্রোতের বাঁকের সঙ্গে। অবশ্য জীব্য না হোক, পাঠ্য ইতিহাসে বিশেষ একটা তারিখও নিশ্চয় স্মরণে অর্থবহ হ'য়ে ওঠে, যেমন ১৭৯৩, ১৮৫৭ বা ১৯০৫। তেমনি বিশেষ বিশেষ আন্দোলনও অর্থ পায় তার ক্রমিকতায়—যথা গান্ধীজির আন্দোলন কটি অথবা ১৯৪৭-এর আপোস-মুক্তি। সাম্যবাদের আন্দোলন, যার সূত্রপাত হয় শতাব্দীর বিশবাইশ থেকে এবং মীরাট মামলার সময় থেকে যার স্রোত নানা উত্থানে স্খলনে বন্ধুর পন্থায়, যে স্রোত এখনও এঁকে বেঁকে চলেছে মহাসমুদ্রের সন্ধানে।

তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোধহয় রাস্তার মোড় ফেরা আরো অস্পষ্ট হয়, কারণ বিশুদ্ধ স্থূলগ্রাহ্য ঘটনা সে জগতে কম এবং মানস জগতে তার ছবিও অস্পষ্ট, অন্তত নিশ্চিত অর্থাৎ সর্বজন-গ্রাহ্য নয়। আমাদের আরো মুশকিল হয়, যখন ছবিটা হয় অতীতের স্মৃতি-নির্ভর, কারণ স্মৃতির দৌরাত্ম্য ব্যক্তিগত তো বটেই, তার পক্ষপাতও সীমাবদ্ধ। বন্ধুবর জোশী যখন লিখতে বললেন, আমাদের অল্প বয়স থেকে সাহিত্যে কি ভাবনা-চিন্তা আমাদের প্রভাবিত বা নির্দিষ্ট করেছে এবং কি ভাবে করেছে, তখন মনে হল দায়িত্বটা বিলক্ষণ ভারি, কারণ তা একটা অবিন্যস্ত অসম্পূর্ণ মানসিক কর্মের মান নির্ণয়েরও দায়িত্ব।

হয়তো বিশদশকের শেষ দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে একটা সামাজিক চিন্তার বা জগচ্চিত্রের রূপান্তর সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু সেটা অপরিচ্ছন্ন বা অপরিপক্ক ছিল এবং বাধ্যতই। তবু খানিকটা স্পষ্ট চেহারা পেল গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে, অথবা স্পেনের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লড়াই থেকে। গৌণ আমাদের কাছেও এই চেহারা একটা মুখ্য বিশ্বজনীন মর্যাদা পেল ১৯৪১ থেকে সোভিয়েট দেশের জন্যে। এদিকে দুর্ভিক্ষের জন্যে, সাম্প্রদায়িকতার জন্যে আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবও হয়ে উঠল মর্মান্তিক।

আমরা হাড়ে হাড়ে বিচ্ছিন্ন আত্মোপলব্ধির যন্ত্রণায় বুঝলুম :—"ভারতবর্ষ পরিণতিলাভের পক্ষে বড় কঠিন দেশ। এখানে মানবিক দৃশ্যে এত কিছু বর্তমান যাতে তোমার রেগে ওঠাই স্বাভাবিক, সামাজিক দৃশ্যে এত কিছু আছে যা তোমায় ভয়ে ক্লৈব্যে স্তম্ভিত করে দেয়, আর জাগতিক দৃশ্যে এত কিছু আছে যাতে তুমি নিজেকে তৃণেরও অধম ভাববে।"

আমাদের দেশের অনেক লেখক, অন্তত আশা করি কিছু লেখকের মনে এই রকম ভাবনা জেগেছিল, যা বছর তিরিশ আগে উপরোক্ত কথায় প্রকাশ করেন অল্প বয়স্ক ইংরেজ কবিই। আর তাইতো যখন বন্ধুবর বললেন তখন আরেকবার গত চারদশকের বাংলা সাহিত্যের কথা স্মৃতিতে জাগল।

তবে এটা ঠিক যে আমাদের লেখকরা এখন আর ভাবতেই পারেন না যে—"এই অঞ্চলে (মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে) চাষীই মনে হয় যা কিছু মহাভারত হারিয়েছে তার জিম্মাদার।" যদিচ এ সত্য উপলব্ধি করাটা আজও দরকার যে "এখানে কি একটা একেবারে বিকল হয়ে গেছে আর সব কিছুই দূষিত।" নিজের চেতনার অন্তস্তলে বাস্তবের ঐ যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থেকে তাই যাত্রা শুরু। তাই তো চলতে হয়, ক্লান্তিহীনভাবে উদ্‌ভ্রান্তি ও শক্তিমত্তা সাধ্যানুসারে অর্জন করতে করতে নিজেরই সত্তার আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে, যে সত্তা ব্যক্তি মানুষেরই অহম্ এবং সমাজে তার জীবনযাত্রার মিলিত ফল। তত্ত্বগতভাবে আমরা সবাই বুঝি যে এই সত্তাকে বিকশিত বা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারায় আমাদের আজন্ম মানবিক দৃশ্যের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস এবং আমরা নিজেদের কৃতকর্তব্যে যে সামাজিক দৃশ্যে আমাদের অবস্থান তার সঙ্গে যেটা আমাদের বিশ্ব দৃশ্যের সৌন্দর্যের, অজস্রতার আর মহিমার একটা বিলক্ষণ সক্রিয় প্রতিশক্তি।

আমাদের অপরিণত বয়সে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা জাগত, তাহলে উপায় কি? চিন্তার সংহত বিশ্ব সহায় হত নিশ্চয়ই; কিন্তু বিশদশকে যাকে বলা যায়—আধুনিক বা কালোপযোগী এমন কোনো বিশ্বদর্শন গজায়নি বহু শোষিত নিপীড়িত এবং বিশৃঙ্খলাহত, প্রায় অমানুষিক দারিদ্র্যে পর্যবসিত আমাদের এই সমাজে। মনে হত, ইতিহাস অবশ্যই শেষ অবধি কাজ করে মানবজাতির জন্যে এক বিশ্বের ন্যায়ানুসারে, কিন্তু এক তালে নয়, এক গায়কি-রীতিতে নয়। কারণ, অর্থ রাজনৈতিক শক্তিসমূহ যা বাস্তব জীবনের আকার প্রকার প্রভাবিত করে, হয়তো নির্দিষ্টও করে, সেগুলি নানা রকম হয়, ফলে রীতি বা

ধরনধারণ ভিন্ন ভিন্ন চেহারা নেয় এবং মানবিক ব্যাপারটাও সব সময়ে সর্বত্র এক চালে চলে না।

সংবাদের প্রসার সেকালে আরো আদিমগতি ছিল, দেশ দেশান্তরে আসত-যেত মাত্রায় কম ও বিলম্বিত চালে এবং বোলশেভিক বিপ্লবের বার্তা আমরা পাই খবরের কাগজের কোণে সংক্ষিপ্ত সংবাদের মাধ্যমে আর মাঝেমাঝে হয়তো রাসেল বা ল্যাস্কির মতো কুন্ঠিত দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের শরণ নিতে হত জ্ঞানের খোঁজে। বস্তুত বিশ্বকম্প সেই দশদিন তখনও আমাদের কাছে বহু দূরের ব্যাপার ছিল। তাই কার্ল মার্ক্সের বিশ্বদর্শনের তত্ত্ব ও কর্ম-যোগও আমাদের চৈতন্যে অঙ্গীভূত হতে লাগল ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের কাঠামোর ঘরানার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বোধহয় এই সামগ্রিক, সর্বাশ্লিষ্ট, যদিচ চিন্তার এক চলমান পরীক্ষামূলক পদ্ধতি যাতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মানুষ এবং নন্দনকর্মী হাতে হাত মিলিয়ে চলে দ্বন্দ্বোত্তরণশীল ন্যায়ের এক সংগঠন, যার বনিয়াদ বস্তুবাদে পাকা ও প্রকৃত জীবনের মাটিতে গভীর। অবশ্যই এই প্রক্রিয়া ধীরগতি হতে বাধ্য, কারণ মানুষের সমগ্র অন্তহীন পারস্পরিকভাবে সংলগ্ন বিশ্বই ছিল এর জগত, কিন্তু এই ক্রমপরিণতির একটা পর্বে, মনে আছে, আমাদের মনে হত যে এ যেন হোলডেরলিন্ পড়ছেন ও পরিপাক করছেন মার্কসকে; যেটা ভাবা আমাদের মন্দভাগ্য ভারতবর্ষে ছিল স্বাভাবিক, যদিচ উন্নয়নপ্রাপ্ত, পশ্চিম ইউরোপে এক মহান ও শ্রদ্ধেয় জর্মান সাহিত্যিকের এই দুই মহাজনের কথা মনে হয়েছিল ঠিক বিপরীতভাবে।

বাংলায় কিছু লেখকের এ জ্ঞানটুকু এসেছিল যে বাঙালি শিল্পকর্মীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধ এবং অনিবার্য কারণেই সীমাবদ্ধ উত্তরাধিকারের ফলে আমাদের সমস্যাগুলি গভীরতর এবং আরো অপরিচ্ছন্ন—যার তুলনায় খাস ইংরেজের পক্ষে তখনও দুর্দান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহানাগরিক রাজধানীর দেশে সমস্যাটা কম গোলমেলে ছিল, অথবা ফরাসি লেখকের পক্ষেও। বাঙালির পক্ষে ব্যক্তিক ক্ষমতা নৈপুণ্যাদির বোধ সাবালক হতে লাগল এক অত্যন্ত বিদগ্ধ কিন্তু মূলত গ্রামবিন্যস্ত সমাজগোষ্ঠীর জীবনে, ঐতিহ্যের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। যার মধ্যে ইতস্তত ভেসে বেড়াতে হয়েছে ছিন্নমূল বেচারি বাঙালিকে, ঘাড়ে তার ইজ-নেসান্স-মার্কা বিচ্ছিন্নতা অথচ লেখার স্বকীয় তাগিদ তাকে নিয়ত সেই চাপ দিয়েছে যার ফলে পরিস্থিতিটা তাকে বুঝতে হয় এবং চলতে হয়—চলতে

হয় চরম শেষ অবধি "অন্তহীন যে শেষ" সেই পর্যন্ত, অভীষ্টের দিকে মুখ ফিরিয়ে, যে অস্বিষ্টের আলেখ্য তখন ছিল অস্পষ্ট অনিশ্চিত, কিন্তু অভীষ্টরূপে যা অবশ্য উপলব্ধি-গ্রাহ্য, অন্তত পরিণাহ রেখায়। এবং সেই ছিল মননের বিশ্বে তার আবশ্যিক পরিক্রমার বীজমন্ত্র।

টি. এস্. এলিঅট, মনে আছে, তখনও যিনি প্রতিষ্ঠায় নবীন এবং তত বেশি গোঁড়ামির বাহনও হননি, তিনিও প্রত্যক্ষে এক সৎ কবিস্বরূপের সন্ধানে, পরোক্ষে মার্কস-এঙ্গেলসের জগচ্চিত্রের অনুধাবনে বিশেষ সহায় হয়েছিলেন তাঁর সময়ের অসম্পূর্ণ, যন্ত্রণাদীর্ণ পশ্চিমা জগতে। এবং সমালোচকরূপেও যিনি বিদ্যুৎবৎ আলোকপাতে এই তাজা সৃজনশীলতাও তার শত শিকড়ের প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ সমস্যাটা স্বচ্ছ ক'রে দেন। বিশেষ করে যদি সে কবিতা চায় দেয়ালির খেলায় নিজেকে পুড়িয়ে ছাই না করতে, অর্জন করতে চায় একটা প্রাণবন্ত শরীর, চায় এক কবির মনের বিকাশবিবর্তনের ইতিহাস হয়ে উঠতে, তা সে কবিটি যতই গৌণ হোক। কোনো লেখকের বিকাশ শুধু মাত্র কৈশোর যৌবনের স্বতঃস্ফূর্তিতে অথবা চিরবালকত্বে সম্ভব নয়, এই পরিণতির আত্মপ্রকাশ সম্ভব সভ্যতার বা বৈদগ্ধ্যের গভীরতায় এবং নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায়।

ইঙ্গমার্কিন কীর্তিমান সাহিত্যিক বোধহয় ইংরেজি সংস্কৃতির ও জীবনযাত্রার ধরনধারণ—এমন কি বিলেতী চীজ্ বা পনির পর্যন্ত এত অনুসন্ধান করেন এবং সম্বন্ধ স্থাপন করতে এত পরিশ্রম করেন, কারণ তিনি মূলত ছিলেন এক মার্কিন যুবক যিনি চাইছিলেন তাঁর বিরাট স্বদেশের বহুমিশ্র পটভূমি থেকে মুক্তি, যদিচ বা যেহেতু, তিনি জন্মেছিলেন এবং মানুষও হয়েছিলেন ঐ মিশ্রতার মধ্যে তার আঁকাড়া নাবালক বৈদগ্ধ্যাভাবের ও আত্মসঙ্কোচক সরলবুদ্ধির মধ্যে।

অধিকন্তু, তিনি ছিলেন খাস শ্বেত উত্তরের মার্কিন, ব্রিটিশ ভারতের কালা আদমির চেয়ে অনেক বেশি ইওরোপীয়। কারণ মানতেই হবে, আমাদের পিতামহ প্রপিতামহদের মধ্যে একটি ভগ্নাংশমাত্র ইংরেজের উপস্থিতি ও আত্মগরজে শিক্ষাদানে কথঞ্চিৎ উপকৃত হন। দুর্ভাগ্যের কথা, কিন্তু অনিবার্য এবং একটা বাঁকানো দুমড়ানোভাবে, কারণ ইংরেজের শাসন শোষণের নীতিতে ও প্রভাবে গোটা ভারতের মানুষের জীবনে অন্যের নির্দেশে পালা-বদলের পথ শুরু হয়েছিল, যদিচ সে পথে প্রগতির চারিত্র্য আনা এখনও চেষ্টাসাধ্য। যদি সান্ত্বনার জন্যে আজ কেউ বলেন, ভারতে "সেই বীভৎস পেগান্ দেবতা যিনি অমৃত পান করেন শুধুমাত্র নিহতদের করোটি থেকে" তাহলে সেটা সত্য

কিন্তু অর্ধ সত্য মাত্র, পশ্চিমা বুর্জোয়া সমাজের নয়া দেবতাও আমাদের পিষে মাথা মাড়িয়েই পানাহার করেছেন ও করছেন এবং সেই ভাবেই আমাদের প্রাচীন, সভ্য কিন্তু অর্থে যন্ত্রে শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ প্রাচ্য দেশে মানবিক প্রগতির পথ পিচ—আলকাতরায় পোক্ত করছেন, রুদ্র ও জাগরনাতের বদলে বসিয়েছেন লুসিফরের পক্ষপুটে ম্যামন্ বেলিঅলদের দাপট।

অবশ্য আশ্চর্য লাগে কী অসাধারণ মনীষায় অতদিন আগে, ১৮৫৩-য় মার্কস্ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন নবজীবনের মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের মূল প্রকৃতি, যে নবজন্ম আজও তার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সাধিত হয়নি। তখন ভারতজ্ঞান ছিল দুর্লভ এবং ভারতীয় জীবনের ইতিহাসচর্চা সবে আরম্ভ হয়েছে, তাও খাপছাড়া খেয়ালে এবং ঝোঁক পড়ত, অস্থানে ও অতিমাত্রায় আর অতিসরলীকরণও তখন ছিল স্বাভাবিক। মার্কসের বিশ্বকোষিক মনের বিরাট কর্তৃত্বের জুড়ি বোধহয় পৃথিবীতে আর হয়নি, মুষ্টিমেয় বিশ্বমানবদের মধ্যে তিনিই বোধহয় বিজ্ঞান বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মননশীল এবং সব চেয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানবিক, অধিকন্তু তাঁর ছিল স্বীয় চিন্তার প্রক্রিয়ারই প্রবল যন্ত্র যার আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল দূরের অস্পষ্ট অনেক কিছু, যথা ইংরেজ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত-শাসন অথবা আইরিশদের দুর্গতি। সব চেয়ে বড় কথা যে তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের কল্যাণে পরবর্তী আমরা সবাই পেয়েছি সর্বমানবের ইতিহাস বিষয়ে কাজ করবার বৈজ্ঞানিক রীতিটি আর পুরোধা তথ্য ও তত্ত্বসন্ধানের উত্তরাধিকার।

অচিরেই আমাদের মধ্যে দেখা গেল যে মার্কসের চিন্তা মোটেই কোনো কিছুর উপরে ফাঁকতালে চাপানো যায় না, যান্ত্রিকভাবে তা টুকে মেরে দেওয়াও যায় না। জীবনযাত্রার মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করা যায়, ব্যাপক ও ব্যক্তিগত নিজের কাজের মধ্যে দিয়েই চেষ্টা করা যায়, এই মননলোকের প্রবল মহিমা পরিগ্রহণের। আমাদের ছিল দুদিকে এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা মধ্যিখানের দায় বিদেশী শাসক ও বণিক পরিবৃত বাস্তব জটিল ও রাজশক্তির পাকানো জীবন চতুর্দিক ঘিরে আর আমাদের সাংস্কৃতিক দৃশ্যের ভাসা ভাসা চড়া বা চর, যেখানে আমাদের কর্মক্ষেত্র। আর লেখকের পক্ষে ছিল আরেক সমস্যা, সীমাবদ্ধ সমস্যার এক গোলকধাঁধা—মোটা কথায় যা বলা যায় সাংস্কৃতিক ও নির্দিষ্ট সাহিত্যিক ঐতিহ্যময় অতীত ও বর্তমান, যে সমস্যার নিরসনে ডুব দিতে হয় স্বয়ং বাংলা ভাষারই লৌকিক ও সৃষ্টিশীল ইতিহাস চর্চায়। কারণ

সাহিত্যসৃষ্টির কাজ সম্ভব নয় যদি না কার্যত নিজেদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যবোধের গভীর উৎসের সন্ধান চেষ্টা করা যায়; বিদেশী ওস্তাদদের গুরু মহাজনদের অনুসরণ করে বিকাশের বড় রাস্তায় পৌঁছনো যায় না, তা সে তাদের ভাব ভাবনা প্রতিক্রিয়াশীলই হোক বা প্রগতিশীলই হোক। বিশেষত, ভাষা বা ধ্বনিতত্ত্বের অথবা নন্দনতত্ত্বের বৈশ্বিক নিয়মগুলি, কার্যক্ষেত্রে মূর্তবিন্যাসের প্রক্রিয়াতেই দেখা যায় স্থানীয়, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অনিবার্যভাবে নির্দিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে আমাদের তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসান্স বা ইজনেসান্সে যে মরা গাঙের ঘাটের জলে আধুনিক অর্থাৎ উনিশবিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতির নিকটতম পিতৃপুরুষরা পানাহার করে স্বর্গে গেছেন, সে ঘাটা-আঘাটায় বাংলার ইংরেজি তুরস্ত ইনটেলিজেন্টসিয়া অথবা গ্রাম্‌সি যাকে বলতেন ইনতেল্লেতুআলি বা মননজীবীরা মোটামুটিভাবে মধ্যবায়ুস্তরেই উন্নতি করে গেছেন, জন্মাহতভাবে তাঁদের দেশজ মাটির থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে। খানিকটা যেন গ্রাম্‌সির ইতালীয়দেরই মতো। আর প্রাচ্য ভারতে যতটা সম্ভব এরাও একরকমভাবে বলা যায় বিশ্বনাগরিক, জাতীয়তার উর্ধ্বে, অর্থাৎ জনসংযোগহীন। এবং এগুলি সবই একেবারে একপেশে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। আমাদের তাই যতটা সাধ্য সেই অনুসারে উপলব্ধির চেষ্টা করতে হত কি পরিমাণে এবং কতদূর পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধিজীবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেছেন গ্রাম্‌সিকথিত "জাতি" থেকে, তাদের দেশের সাধারণ লোকের কাছ থেকে এবং কি রকম ঐতিহাসিক অবস্থা ব্যবস্থার মধ্যে।

এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক, কি ভাবে, লেখক হিসাবে, আমাদের এই সত্য বা তথ্য বিষয়ে অবহিত হতে হয়—যদি আমরা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমাদের আত্মপরিচয়ের সত্তাকে, যদি আমরা মনে করি যে আমরা "আধুনিক" শিল্পকর্মে অনুপ্রাণিত বা আমরা যুগান্তর আনতে চাই শিল্প সাহিত্যে, অর্থাৎ পরিণত হয়ে উঠতে চাই অরিজিন্যাল বা মৌলিক অর্থাৎ প্রকৃত শিল্পী, স্বভাবে, জীবন্ত স্বকীয় সংবেদ্যতায় আর মননপ্রক্রিয়ায়। একমাত্র তাতেই হয় প্রাণময় শক্তিতে গতিশীল তার টেকনীক বা আঙ্গিকের ও তার বাহন অর্থাৎ বিষয় শরীরের কর্তৃত্ব, তখনই সম্ভব হয় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অগ্রগামী কর্মিষ্ঠতা। আমাদের চৈতন্যে বাধ্যতই এসে পড়েছিল সংকট বোধ—বৃহত্তম অর্থে ব্যক্তিগত এবং সেই হেতু সামাজিকও বটে, এবং বাধ্যতই এক সদা চলমান সংকট উত্তরণের বা সমাধানের দ্বৈতাদ্বৈত দ্বান্দ্বিক ন্যায়তত্ত্ব।

এখন, অবশ্য পরিস্থিতিটা আরো বেশি যন্ত্রণাকর এবং জটিলতর, আশা হয় এত বেশি যে বিষফোড়া যেন ফেটে পড়ার অর্থাৎ আরোগ্যের মুখে। এক পক্ষে আমরা দেখি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রখর বিভাগ, এদিকে কিছু লোক যারা এখনও কিছুতেই নিজেদের মননের সংহতির স্বপ্ন ছাড়তে পারে না আর অন্যদিকে বাকি লোক, পল বারান্ যাদের পেশা বলতেন বাধ্যত বুদ্ধিজীবিকা। ব্যাপারটা আরো বিড়ম্বনাপূর্ণ করুণ হয়ে উঠেছে কারণ উপর তলার গ্লানির সংক্রমণ সব তলায় ব্যাপ্ত, যার ফলে কালের যাত্রার রথের রশি যাদের হাতে তারাও উদ্‌ভ্রান্ত, মিশ্রলক্ষ্য। কিন্তু সেকালে আমরা অনেকে তুলনায় কিছুটা ভাগ্যবান ছিলুম কারণ হায়! ভাগ্যের পরিহাসে আমরা জন্মেছিলুম আমাদের ইতিহাসের উলঙ্গ ব্রিটিশ যুগে এবং বিবেচ্য বিষয়গুলি তুলনায় স্বচ্ছতর ছিল এবং হয়তো সরলতর। তার উপরে, জাতীয়তার কম বেশি ঐক্যবন্ধন তখন অন্তত হৃদয়ে উত্তাপ দিত, জঙ্গী স্বজাতিপ্রীতি ও স্বদেশপ্রেম রাখীবন্ধনে ছিল আরো সবল, আজকের আমাদের এই ইঙ্গমার্কিনস্বায়ত্ত সরকারের ধনতান্ত্রিক জগতের বর্তমান ভেজালের তুলনায়।

কিন্তু মুখ্য বিষয়ে ফেরা যাক। আমরা দেখলুম পিতৃপুরুষদের নিকটতম ঐতিহ্যের নিবিষ্ট পাঠগ্রহণে একটা মুক্তিদাতা শক্তি মেলে। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা অবান্তর এবং লেখকের পক্ষে পুনরাবৃত্তি মাত্র। সংক্ষেপে ধুয়া ধ'রে বলা যায় যে আমরা দেখলুম ইঙ্গনেসান্সের ঐ অভিযানের পালা আমাদের পক্ষে কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হতেই পারে না, মহান বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর নীরব কিন্তু গভীর মানবিকতায় বা মানববাদেই যেটা উপলব্ধি করেছিলেন। অন্য মার্গে মাইকেল মধুসূদনও তা আবিষ্কার করেন নিজের ট্রাজিক অভিজ্ঞতার ঝঞ্ঝায়, শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিময়তার জয়লাভের মধ্যে দিয়ে। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রমেশ দত্ত ও মাইকেলের জয়লাভের ফলাফলকে নিজ নিজ সাধ্যমতো বহমান রাখেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপরেই দায়টা পড়ল তাঁর মানবিকতা এবং প্রচণ্ড প্রতিভার অসাধারণ ব্যাপ্তিতে আমাদের পথসন্ধানের এবং নির্মাণেরও। সেই পথে-পথেই উনিশ শতকের কথঞ্চিৎ অমর্ত্য সৌকুমার্য ও শিল্পসাহিত্য চর্চার উত্তরণের তাঁর চেষ্টার বিস্তৃত আলোচনা হবে এখানে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এখানে শুধু মনে রাখি যে নিজেদেরই দুর্বলতার সীমিত গরজে বাংলায় তথা অন্যত্রও, আমাদের পক্ষপাত ছিল এবং এখনও অনেকের মধ্যে আছে, রবীন্দ্রনাথের

জীবন ও শুভঋষিকর্মে অশান্ত তৃপ্তিহীন কর্মিষ্ঠতার প্রতি নয়, তাঁর প্রকৃতই অর্জিত স্থিরধীর আত্মস্থ পের্সোনার প্রতি। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবনও কর্ম সাধনার ফলে অশান্তি অতৃপ্তির মধ্যেও একটা মিশ্রসঙ্গীতের সমন্বয় তাঁর চারিত্র্য দৃঢ়ভাবে অর্জন করেছিল, এবং করেছিল তাঁর পারিবারিক সামাজিক প্রভাব সত্ত্বেও। এ সত্য বোঝা যায় সেই কবিকাহিনী থেকে শেষ লেখা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট অবধি সমস্ত রচনা মনোযোগে, খণ্ডিত নয়, সামগ্রিক দৃষ্টির পাঠে। অবশ্য সে পাঠ ঐতিহাসিক কারণেই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশ পঁচিশ বছর অগ্রজদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তার ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতাও হাওয়ায় ওঠেনি।

তাছাড়া, ঐ রবীন্দ্র চিত্রটি আমরা মনের দেয়ালে দেয়ালে বাঁধিয়ে রাখি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময়টায় বছর কয়েক ধ'রে ইওরোপে তাঁর যে মূর্তি গড়ে উঠেছিল তারই ছায়ায়। ইংলণ্ডে ও ইওরোপেই বিষণ্ণ তরুণ ও মধ্যবয়সী ভদ্রলোকেরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন হাওয়ায়, এবং যুদ্ধের মধ্যে ও পরে এই রকম প্রাচ্য ঋষির শান্তমূর্তির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এবং আমাদের বিশ্বকবি তাঁর কয়েকটি রচনার সীমাবদ্ধ আপতিক অনুবাদের মাধ্যমে এই শান্তি সৌন্দর্যের বোধ বিতরণ করলেন আহত ব্যথিত মানবমনকে শান্ত করতে। তাঁর ব্যক্তি স্বরূপকে ইওরোপ পরিয়ে দিলে প্রাচ্য ঋষির জোব্বা, এবং তাঁর কাব্যমণ্ডিত অনুবাদগুলি মুগ্ধ করল অনেক বিদগ্ধ পাঠককেও। তিনি এই সম্মানের পোশাক পরেও ছিলেন খুব সুন্দর এবং তাঁর পক্ষে সত্যই স্বাভাবিক-ভাবে। কিছু অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা, বিশ্বাসপ্রত্যয় খানিকটা শুচিবাদী এবং আভিজাত্যে স্বতন্ত্র তাঁর পারিবারিক আবহাওয়ায় তাঁর কাছে আবাল্য সত্য ছিল। দীর্ঘকাল ধ'রে অক্লান্ত শিল্পকর্ম ও বৃহৎ সামাজিক এমন কি বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতায় সেই সত্য একটি বৃহৎ নন্দনধর্মের তত্ত্বে তাঁর বিকাশেই সম্ভব হয়েছিল, তিনিই তাঁর ক্ষুরধার শ্রমসাধনায় রূপান্তরিত করলেন তাঁর মহৎ কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার। এবং তিনি দৈনিক জীবনযাত্রাতেও, শান্তস্থির কিন্তু চেতনে অবচেতনে প্রচণ্ড শক্তিতে জীবনযাপনকে মেলাতে চেয়েছিলেন এই বিশ্বাসের তত্ত্বের সঙ্গে। এবং ভারতীয় ব্রহ্মবাদীর পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা ছিল না এই সুন্দরের ঋষির স্বকীয় পের্সোনা বা ব্যক্তিরূপ গ্রহণে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে যা সদা স্মর্তব্য তা হচ্ছে যে তিনি কি কঠিন সংগ্রাম সাধনা করে যান এবং নিজেকে প্রায় সর্বদা কি ভাবে তীক্ষ্ণ সজাগ রাখেন এই

আস্তিক নীতিকে রূপায়িত ও উপলব্ধ করবার জন্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনে তথা সাহিত্যিক শিল্পীর বহুবিধ কর্মে। এই অর্থে বলা যায় যে তিনি ঋষি হয়ে জন্মাননি, নিজেকে ঋষিত্বে পরিণত করেন এবং তাঁর এই ঋষিত্বের বিকাশ শেষ কয় দশক ধ'রে প্রবলভাবে মানবিক বা মানববাদীই ছিল। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, আমি মিস্টিক নই হে, আমি কবি। কারণ মরমীয়া অধ্যাত্মসাধকেরা মানুষের ও প্রকৃতির বিশ্বকে পরিহার করে চলেন, কড়ি ও কোমলের রবীন্দ্রনাথ মানুষের মর্ত্য প্রাকৃত জীবন শেষ দিকে সম্পূর্ণ পরিগ্রহণ করেন। গতিতে, প্রগতিতে, বিকাশে তাঁর বিশ্বাস উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতার দিকে যায় এবং তাঁর মতো মহান বহুজন পূজিত পুরুষের পক্ষে নিশ্চয়ই এই মুক্তমন শক্তিমত্তা আশ্চর্য ব্যাপার। এবং দেশবাসীর দুর্গত জীবনের চিন্তাও ছিল তার মাটিতে।

নিজেদের স্বভাববশেই আমাদের দেশে মনোযোগে পড়েছে কম তাঁর অসিধারব্রত সংগ্রামে, তাঁর সদাগতিশীল নিয়মসংযম যা তিনি নিজেই নিয়ন্ত্রিত করেন নিজের উপরে, যা না করলে নিজের ও চতুর্দিকের বাস্তবজীবনের অন্তহীন দাবিদাওয়া পালন করা এবং বহুধাক্রিয় মানুষের অখণ্ডতা উপলব্ধি করা অসম্ভব। নির্বিঘ্ন শান্তির গ্রাম্য নদীতে তাঁর বিকাশের তুলনা নেই, প্রথম যৌবন থেকে শেষ জীবন অবধি বারবার ক্রমান্বয়ে তাঁকে যে ক্রান্তিসংকট বিচলিত করেছে, সেগুলি তাঁর সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন স্রোতে বিরাট হ্রদ নির্মাণ। তাঁর এই সংকটসংকুল জীবনে মাঝে মাঝে চূড়ায়িত হয়েছে এমন যন্ত্রণা যে তাঁর, আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনেও এসেছে আত্মহত্যার মনোভাব।

কিন্তু এই সামান্য স্মৃতিচারক নিবন্ধ রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন আত্মপরিচয় ও কৈবল্যের সংকটে কণ্টকিত মহাজীবনের ইতিহাস নয়। মূল বিষয়ে এক কথায় ফেরা যাক, রবীন্দ্রনাথই যে আমাদের মহা মহা পূর্ব পুরুষদের মধ্যে যার অভাব ছিল, তাই পূরণ করে দেন, তিনিই ব্যক্তিস্বরূপকে বিকাশে চালিত করেন; তিনিই স্বকীয় পথে অর্জন করেন সংহত বৃহৎ মানবিকতার সত্তার বা আত্ম-পরিচয়ের সৃষ্টি শীল ঐশ্বর্য—এ জ্ঞান আমাদের হল। কিন্তু তাঁর মহৎ উদাহরণই হয়েছিল অনুকৃতির একটা বিপজ্জনক উৎস, তাঁর উত্তরসাধক অনেকের পক্ষে; কারণ তাঁদের ছিলনা রাবীন্দ্রিক অভিজ্ঞতা এবং ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস, অথবা যে ব্যক্তিস্বরূপ তিনি সংগঠিত করে তোলেন তাঁর নিহিত দার্ঢ্যের ঐশ্বর্যগরিমা।

ফলে এঁদের অনেকের কলমই চলত কারণে অকারণে ফোয়ারার মতো এবং সাহিত্যজীবনে এঁদের বিশেষ কোনো সংকট বোধে ভাবিত হতে হয়নি। তাই, তাঁদের সহজ আবেদন এবং গৌণ নানা রকম কৃতিত্ব সত্ত্বেও হাওয়ায় ছড়ায় আরো ভ্রান্তিবিলাস, যে যে হাওয়ায় আমাদের শ্বাস নিতে হয় আমাদের অল্প-বয়সে। বস্তুতপক্ষে রাবীন্দ্রিক এই খণ্ডিত ভাব সম্পূরণ পায় আরেক বিশ্ব-দর্শনের বিশ্বনির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে। তখন আমাদের দেশেরও আশেপাশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াটাও উত্তরোত্তর মর্মান্তিকভাবে জটিল ও একীকৃত হয়ে উঠছিল সারা দুনিয়ার সঙ্গে অনিবার্য ও দ্রুত বর্ধমান জটিলতার মধ্যে। আর এই দুনিয়াটা তখন ধনতন্ত্রের ফাসিস্‌মের শক্তিসমূহের নির্মম চতুর পর্বের দুনিয়া আর তাদের হাতে যেমন অস্ত্রশস্ত্রের তেমনি নানাবিধ রাজনৈতিক হাতিয়ারের সংগ্রহ। দেখা গেল এই সব শক্তিধরেরা যে জীবন-দর্শনে সমস্ত জীবন আধৃত, যার কর্মসূচীতে সমগ্র মানবসভ্যতা ধনতন্ত্রের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে, যার অখণ্ডতায় সব কটি মৌলিক জ্ঞানের কর্মের তত্ত্ব বিন্যস্ত, সেগুলিকে ছিঁড়ে কেটে অসংলগ্ন কয়েক টুকরো ব্যবহার করতে লাগল নিজেদের বিপরীত মানববৈরী উদ্দেশ্যসাধনে। কিন্তু ইতিহাস শেষ পর্যন্ত এই দিকেই, এবং মানুষের সক্রিয় মনে ধৈর্য ও শ্রমসাধ্য আশা অমর।

তাই যে মানুষ সীরিঅস্‌ অর্থাৎ স্বভাবের গভীর থেকে লেখক বা শিল্পী অথবা "ফেরিআনদের মধ্যে বা আরো খারাপ কুসঙ্গে পতিত একটি ভালো মানুষ"ই হোক, তাকে নিমগ্ন হতেই হবে জীবনের বাস্তব সত্যে—এবং লেখক মানুষ তো সব সময়েই সামাজিক জীব। একেই তো স্বকীয় দেশ কালে বৈশিষ্ট্যে নির্দিষ্ট ইওরোপীয়-মার্কিন হেনরি জেমস্‌ বলেছিলেন: নেতির মৌলিকতায় মগ্ন হও—into the destructive element immerse কারণ কবিরা, আর্টিস্টরা বোঝেন যে, যতই অস্পষ্টভাবে হোক, এবং স্ববিরোধীভাবেও হোক, তার বিশেষ গুণপনা ও সামাজিক সমগ্র চৈতন্য দাবি করে বিকাশের বিশেষ এক শ্রেণীর নিয়ম ও পালন করে যাওয়া, ঐ নিয়মাবলীরই নিজস্ব প্রজ্ঞা বা প্রাপ্ত নিয়মশৃঙ্খলার নিষ্ঠায়। আমাদের সমকালীন এক মস্ত বড় শিক্ষার আমরা এর আশ্চর্য প্রকাশ দেখেছি,—বের্টোল্ট ব্রেখটের মধ্যে, যিনি এই দাবি পূরণে সক্ষম হয়েছিলেন সর্ববিধ বিপদ আপদের ভয়ঙ্কর কয়েক বছরের মধ্যে বেঁচে থেকে এবং সমানে কাজ ক'রে। ব্রেখটের অদ্ভুত কষ্টের মধ্যে দিয়ে অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে কবিতা নাটক অপেরা রচনার ও প্রযোজনার পঁচিশ

ত্রিশ বছর পল্লবগ্রাহী বা রাজনৈতিক দলীয় মনোভাবাক্রান্ত রসজ্ঞদের কারো কারো মনে হতে পারে যেন কিছুটা ওস্তাদের কসরত খেলা, কিন্তু বস্তুত ব্রেখটের ব্যক্তি ও শিল্পস্রষ্টা জীবন দুইই এক সংবীরত্বের, যদিচ বিড়ম্বিত, লড়ায়ের কয় যুগব্যাপী কষ্টের সার্থক জীবন। তাঁর পারিপার্শ্বিক দিন কালের চাপেই তাঁকে যেন ষাঁড়ের লড়াই আঙিনায় মাতাদোরের খেলোয়াড় দক্ষতা আয়ত্ত করতে কিংবা তরোয়ালের উপর দিয়ে ট্রাপিজ্‌ নর্তকের মতো অসামান্য প্রতিভার দৌড় দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু এই স্মৃতিচারণের প্রবন্ধ প্রয়াস বোধহয় এবারে ক্ষান্ত করা যায় মার্কসীয় চিন্তার এক প্রাজ্ঞ ও মহানুভব ভাষ্যকার গ্রামসির কথা তুলে। গ্রামসি লিখেছিলেন :

"দীর্ঘ দৃষ্টি বা প্রাক প্রবুদ্ধি আর কিছু নয়, শুধুমাত্র বর্তমান ও অতীতকে চলমান বলে গতিরূপে স্পষ্টত দেখা ; অর্থাৎ প্রক্রিয়াটির মূল এবং স্থায়ী দিক-গুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করা। কিন্তু এই দীর্ঘ দৃষ্টিকে নিছক বাহ্য বা বিষয় সর্বস্ব ভাবাটা আজগুবি হবে। বাস্তবে প্রাক প্রবুদ্ধ বা দীর্ঘ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মানসে থাকে একটা বিশেষ লক্ষ্য, একটা বিশেষ অভীষ্ট কর্মসূচী, একটা কার্যক্রম এবং প্রাকপ্রবুদ্ধি সেই লক্ষ্যে পৌছবার সহায়। তার অর্থ এ নয় যে প্রাক্‌-দৃষ্টি সব সময়েই যথেচ্ছ বা আকস্মিক হবে অথবা কোনো বিশেষ প্রবণতায় চালিত হবে। বস্তুত, এই পূর্বাপর দৃষ্টির কয়েকটি যে বিষয়মূলক বা বলা যায় কর্মবাচক দিকগুলি প্রকৃতপক্ষে ততখানি নৈর্ব্যক্তিক বা বিষয় প্রধান যতটা তা একটা লক্ষ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট : (১) যেহেতু একমাত্র আবেগই শাণিত করে মস্তিষ্ককে এবং অন্তর্জ্ঞানকে স্বচ্ছতর হতে সাহায্য করে ; (২) কারণ বাস্তব সত্য উপস্থিত হয় মানবিক ইচ্ছাশক্তি বা সংকল্প বস্তুসমূহে প্রয়োগ থেকে (যন্ত্র চালক এবং তার যন্ত্রের মতোই)'; যদি কোনো ইচ্ছাশক্তির বা সংকল্প-শক্তিকে বাদ দেওয়া যায় অথবা যদি একমাত্র অন্যের ইচ্ছা বা সংকল্পকে প্রক্রিয়া-স্রোতে একটি বৈষয়িক বা নৈর্ব্যক্তিক মূল বিবেচ্য বলে ভাবা যায়, তাহলে বাস্তব সত্যকেই বিকলাঙ্গ করা হয়।"

মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের পক্ষে সম্ভব করেন এই প্রাকবুদ্ধির অন্বেষা এবং তার চর্চা এবং তা নান্দনিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রেও। এই প্রাকপ্রবুদ্ধি অবশ্যই গণকঠাকুরের ভাবীকথন নয়, শুধুমাত্র মনে সদা প্রস্তুত থাকার একটা সক্রিয় অবস্থা, যেন শেকসপিঅরের সেই "প্রস্তুতিই সর্বসার" বা "পরিপক্কতাই সারাৎসার।"

বস্তুত, এই প্রাকপ্রবৃদ্ধিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিকাশ সম্ভবপর করে তুলেছিলেন। তিনি নিজেই লিখে গেছেন কি ভাবে যাত্রা অল্প বয়সে আরম্ভ করেন কবি কাহিনীতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে। তাঁর ভাষাতেই আমরা জেনেছিলুম কি বিরাট অরণ্য তাঁর হৃদয় ঢেকেছিল এবং কি ভাবে হল তাঁর নিষ্ক্রমণ। অবশ্য, একথা মানতেই হবে যে রবীন্দ্র পরবর্তী কালে আমাদের জীবন আরো কুৎসিত এবং জট পাকানো আর নিঃসঙ্গ তরুণ হৃদয়ের অরণ্য হয়ে পড়েছে—বেথটের ভাষায়—শহর শহরতলির ভয়াবহ পচা আগাছার জঙ্গলে আর বন্ধ দগ্ধ গ্রামে গ্রামে। তবে রয়েছে ঐ পূর্বসূরীদের বিশেষত রবীন্দ্রনাথের ক্লান্তিহীন জীবনের ও কর্মের বীরত্বময় উদাহরণ। আর ব্যাপক ও গভীর সাহায্য করেন মার্কস্, যাঁর ভাবনা চিন্তা আমাদের প্রাক প্রজ্ঞার সন্ধানে মস্ত সহায়।

জনৈক লেখকের কৈফিয়ত

হঠাৎ প্রশ্ন হয়েছিল—কি করে লেখক হয়ে উঠলুম ?

যে নাটকীয় অতিকথনে সক্ষম হলে এই প্রশ্নের ভঙ্গীতেই উত্তরটাও হঠাৎ দেওয়া যায়, তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মতো জাগতিক ঘটনার পরে বাংলা কবিতার কর্মীর পক্ষে, অন্তত বর্তমান লেখকের মতো আত্মসংকুচিত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এবং এই সংকোচের বিনয় লেখকটির অল্পবয়স থেকেই। তাই তো সে সেকালেই উপলব্ধি করেছিল যে কবিতারচনা ব্যক্তিস্বরূপের আত্মপ্রকাশ নয়, আসলে তা ব্যক্তিস্বরূপের হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণ। এবং, তার প্রথম বই উৎসর্গ করেছিল যাঁকে সেই কৃতজ্ঞতাভাজন নীরেন্দ্রনাথ রায়কে লিখে দিয়েছিল যে মাইনর কিন্তু সৎ কবিতাকার হবার প্রস্তুতিতেই তার আশা চূড়ায়িত।

বস্তুতপক্ষে দৈবী প্রেরণার মহত্ত্বের বশবর্তী হয়ে লিখি এমন ভাবনা সম্ভব ছিল অপেক্ষাকৃত অবিচ্ছিন্ন সমাজের সেকালের মহাকবিদেরই। এবং একালে বোধহয় এক মহাজাতির আত্মজ্ঞানের উন্মেষে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই।

অবশ্য কোনো সৌভাগ্যবান উপন্যাসকার হয়তো তাঁর রচনার বিষয়-মাহাত্ম্যের কিংবা নিছক রম্যরচনার অথবা প্রচ্ছন্ন আত্মজীবনীরই নিশ্চয়তায় এই প্রশ্নের জাঁকালো উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু কবিতা তো লেখাই হয় শব্দের ছন্দের প্রায় অবচেতন অর্থাৎ খানিকটা ব্যক্তির বাইরে নিজস্ব তাড়নায়। ভাষার প্রকাশ্য সত্তা শক্তি পায় কবিতার ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি কথার এই চেতন-অবচেতন সঞ্চারিত ধ্বনির ফল্গু-স্রোতে।

তবে এই:চাপের বোধ সবসময়ে এক কবিব্যক্তির মনে থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই, অভ্যাসিকতার বলঅর্জনে আত্মীয়বন্ধুর বিবাহের পদ্যও সে লিখে ফেলতে পারে, উপলক্ষের তাগিদে অথবা নির্বন্ধে। এমন কি নিছক দশটাকা পুরস্কারের লোভেও বালক তার প্রথম কবিতা লিখে বালক-বালিকোচিত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় পাঠাতে পারে। এবং পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার বা পদ্যরচনার মজাটা পেয়ে যায় আর লিখে যেতে চায় নিজের নানারকম কৌতূহলের খুশিতে, যদিচ সে খুশি মুখাপেক্ষী হয়

—কালোচিতভাবেই—সত্যেন্দ্র দত্তজ রাহারের এমন কি জিজ্ঞাসু তার যশোলিপ্সুও বটে—আত্মপ্রসাদে একটি রীতিমতো পদ্যরচনা প্রবাসী-র মতো তখনকার উচ্চবর্ণ পত্রিকায় পাঠিয়েও দেয়। তার একটু অবাকই হয় যখন ডাকটিকেটটাও ফেরত আসে না। উল্টোদিকে আবার অবাক হয়ে যায় কিছুকালপরে বিচিত্রা পত্রিকার কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসে। যেমন খুশি হয় ঢাকার প্রগতি পত্রিকার বুদ্ধদেব বসুর বিস্মিত চিঠি পেয়ে অথবা কল্লোল এর দীনেশ দাশ ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তের সমর্থনে।

এই ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে এল বিনিদ্র "জন্মাষ্টমীর" শেষাংশের আরম্ভের অসম্পূর্ণ গোটা দশেক লাইন—

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ; আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ অবর্ণ্য নির্মেঘ দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে
নৈকট্যে মধুর। — ইত্যাদি। তখন নিতান্তই অসমাপ্ত দশ লাইন। কিন্তু ঝোঁকটা বোধহয় অন্তরঙ্গই ছিল, কারণ সবটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রায় দশবছর পরে হঠাৎ এবং প্রাথমিক দশলাইন স্বতই এসে গেল বিলক্ষণ দীর্ঘ কবিতা "জন্মাষ্টমী"র -অনেকের যেটাকে মনে হয়েছিল থানইট জাতীয় কিছু এবং বুদ্ধদেব বসু যেটাকে কবিতা পত্রিকায় ছাপেন এক বন্ধুর সঙ্গে নাকি একটা বিচ্ছেদ সত্ত্বেও। তারই শেষ অংশের আরম্ভে - ও ফ্রয়েনডে নিখ্‌ট্‌ ডীজে টোনে— বয়োজ্যেষ্ঠ ভিন্নবাদী কিন্তু গভীর সৌহার্দ্যে মূল্যবান সাহায্যে উচ্ছ্বসিত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে নিবেদিত।

ঐ প্রথম সংকটযুগের গোড়ার দিকেই লেখা হয় "উর্বশী ও আর্টেমিস" এর সেই সব কবিতা, "চোরাবালির" কিছুকিছু ভের্ দ সোসিয়েতে-মার্কা লঘু কবিতার পরের লেখা, যাতে লেখকের লিখন-চৈতন্যও ছিল সংকটদীর্ণ কিন্তু আবার উল্লসিত ভাষাও ছিল তাই দ্বিধান্বিত কিন্তু স্বাধিকৃত, ছন্দে মিলে কর্তৃত্ব হয়তো সময়ে সময়ে মনে হয় গৌণ—প্রচ্ছন্ন একটা মুক্তিবোধের নন্দিত চৈতন্যে, কিন্তু যে মুক্তি ছিল অনিদ্রাতত স্নায়ুর জ্যা-মুক্তি।

তারপরে এল আকস্মিকভাবে আমাদের পটলডাঙা পাড়ায় পুরোনো বইএর কারবারী ইউসুফের দাক্ষিণ্যে এলিঅটের "দি সেকরেড উড" আর "পোয়েমস ১৯১৫", পুরোনো কিন্তু সস্তা—টাকা টাকা। কিন্তু প্রায় আনকোরা অবস্থায়। এলিঅট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটাকয়

মার্কিন কবিতার সংকলনে—কেপের এমেরিকান পোয়ট্রি ১৯২২-এ নয়; সেকারের মডর্ন এমেরিকান পোয়েটস নামক ১৯২২-এর এক সংগ্রহে। তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা দি ক্রাইটেরিঅন চোখে দেখিনি। অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের মুগ্ধ পাঠক। কৌতূহল থেকে হল, বলা যায় এলিঅটপাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য। তখনও সুধীন্দ্রনাথের বেশি কিছু রচনা ছাপা হয় নি বোধহয়, এক সবুজপত্র-তে একটি দুটি কবিতা ছাড়া। তারপরে হল "কাব্যের মুক্তি" নামক প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাষ্যটি। এবং সেটি আমরা কয়েকজন অর্বাচীন ইউনিভর্সিটি ইনস্টিটিউটের ওপর তলার এক ছোটঘরে ফরাশ বিছিয়ে বসে শুনলুম। সুধীন্দ্রনাথের উদার রবীন্দ্রোত্তর আগ্রহ লেখকের কবিতা লেখার অভ্যাসকে প্রচুর উৎসাহিত করেছিল। এমন কি পরে যখন তাঁর জীবনযাত্রার ধরন ও তাঁর সমাজ রাজনীতি একেবারে পালটে গেল, তখনও কবিতা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর আর অনবচ্ছিন্ন।

আর এলিঅটের জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল শুনেছিলাম পিতৃপুরুষের ভাষায় দেওয়ানজির পুত্র চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের জামাতা অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ সাহেবের। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অবৈতনিক প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে দুটি তিনটি চিঠির সূত্রে। তিন-চার বছর পরে অপূর্ববাবু নিছক শখ করে প্রীতির দাক্ষিণ্যে আমাদের কয়েকজনের জন্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করেন এবং এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্য ও ইংরেজি শব্দতত্ত্ব পড়াতে আরম্ভ করেন। এলিঅটের কল্যাণে তখন আমরাও এলিজাবিথান নাট্যকাব্যের ভক্ত।

এলিঅটের সেকরেড উড-এর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে এবং এইরকম আলোকিত ধাক্কা ফলপ্রসূ হয়—অন্তত তাই আশা করেছিলুম – কারণ তখন মনে হয়েছিল এইরকমই তো আমরাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। এবং তাঁর দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড নামক তাঁর তখনকার দীর্ঘতম কবিতাটি বিচলিত করে এত গভীরভাবে যে লাইনগুলো ঘরে-বাইরে ট্রামে বাসে মনে গুঞ্জরিত হত এমনই তার জাদুর ভয়ঙ্কর কিন্তু লিরিকল শক্তি, একটা ঘোরের মধ্যে বহুকাল কাটে তীব্র নান্দনিক আতত্তিতে।

মনে আছে, পাণ্ডিত্যের উচ্চাশা, তখনও ছিলনা, কিন্তু নিতান্তই কবিতাটির আবেদনের প্রাবল্যে বিস্তর সময় যায় নিছক আনন্দেই, যাতে অনেকগুলি উল্লেখ উদ্ধৃতির সূত্র আবিষ্কার করে করে ঐ মৌল নন্দনকে আরো অর্থবহ করতে পারি। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অসাধারণ ছিল যাঁর প্রাণময় শিক্ষণ উৎসাহ আর বহুভাষার সাহিত্য বিষয়ে তন্নতন্ন জ্ঞান কিন্তু যিনি আঠারো শতাব্দীর পরে প্রায় সব কাব্যসাহিত্যই বিপথগামী অথবা বাজেই মনে করতেন—এক হিসাবে প্রায় সমালোচক এলিঅটের মতোই পক্ষপাতিত্বে কিন্তু এলিঅটের রচনা তিনি চালিয়াতির প্রলাপ মনে করতেন, পাউণ্ড আর জয়েসের মতোই। তিনি এলিঅট কাব্যের আমার পাঠাহত কপিটা একদিন দেখে অবাক। তাঁর স্নেহ আমি পেয়েছিলুম পেশাদার ছাত্রের খ্যাতি না থাকলেও, তিনি বইটা নেড়ে চেড়ে শুধু বললেন, এ লেখায় তুমি কি পাও, এ তো পাগলামি বা চালিয়াতি। জিজ্ঞাসা করলেন কি ক'রে ঐ নানা ভাষার উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ বা উল্লেখগুলির সূত্র পাশে বা পৃষ্ঠার উপরে-নিচে লিখেছি। যখন আত্মগ্লানিতে বললুম যে মূল বইয়ের পংক্তি মিলিয়ে মিলিয়ে অভিধান দেখে অথবা দ্বিভাষিক সংস্করণ দেখে, তখন তিনি মহাখুশি হয়ে পিঠে চপেটাঘাত ক'রে বললেন, That's the way to read my boy! যদিচ পরীক্ষার নিচের তলার ভাড়াটে যুবকটি এলিঅট ও পাউণ্ড ঐ ভাবে পড়েছিল নিছক সংবেদ্য-পাঠের আনন্দের তাগিদেই। নীরেনবাবুকে তিনি তো প্রশ্নই করেন, আচ্ছা ও কি ঐ সব লেখায় সত্যি স্যাটিস্‌ফ্যাকশন পায়? পাণ্ডিত্যপনায় এবং সমর্থক উত্তর শুনে নাকি মেনেও নেন, সে উদারতা তাঁর ছিল।

অন্যদিকে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যাঁর সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে ইতিহাসে ভূগোলে জ্ঞান ও প্রাণময় আগ্রহ ছিল আশ্চর্য। যাঁর বিষয়ে প্রফুল্ল-বাবুর মতো কড়া বিচারকও বলতেন: আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতে একমাত্র রবিরই আছে নিজের রুচিবোধ ও স্বাধীন বিচারমান। রবিবাবুর আত্মসংকুচিত বিনীত সজ্জনস্বভাব কিন্তু প্রতিষ্ঠাখ্যাত বহুবিধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে আর অধ্যক্ষ জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এলিঅট-পাউণ্ডদের রচনায় বিস্মিত ও নন্দিত পাঠই তার প্রমাণ। রবিবাবুর তখন থেকেই স্থির লেখকের প্রতি আশ্চর্য স্নেহপ্রীতি ও সাহিত্যিক পরিগ্রহণ ও অনুমোদন। এবং ঐতিহ্যজিজ্ঞাসায় তাঁর জ্ঞান ছিল সহায়।

বস্তুত, এলিঅটের ও পাউণ্ডের ঐতিহ্যবিস্তারী প্রভাব যে ঐতিহ্যসন্ধান

ও ব্যক্তিস্বরূপ আর সাহিত্যরচনার বিষয়ে তাঁদের সাহিত্যরচনা ও আলোচনার মাধ্যমে আলোকপাত অন্তত দুজন বাঙালি লেখককে তা লাভবান করেছিল, হয়তো ভিন্ন ভিন্ন পুরুষার্থে এবং মাত্রায়।

অন্তত একজন তাই থেকে উত্তরোত্তর বুঝতে লাগল যে পথ চওড়া হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে, প্রাদেশিক অর্থে সাহিত্য সৃষ্টি ও চর্চা থেকে সাহিত্যের উৎসে এবং বহুতায়, ইতিহাসে, জীবনের দর্শনে, জ্ঞানের কর্মিষ্ঠতায়। কাল্পনিক ধর্মীয়তায় নয়, মৃত বা ভুঁইফোঁড় বর্বর রক্ষণশীলতায় নয়। দেখল যে অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজন্যবাদী এলিঅটের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজজীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থাৎ বর্তমানেই। এবং সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সঠিক রূপান্তরের চৈতন্য।

আর তখন এদিকে চলছে রবীন্দ্রনাথের দিগ্বিজয়ী কীর্তিযাত্রা আর তাকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ পরিগ্রহণের আবহাওয়া। আর গান্ধিজির আন্দোলন-গুলি দেশকে থেকে থেকে দোলা দিচ্ছে আর থেকে থেকে প্রত্যাহার প্রায়শ্চিত্ত চলছে, চোখের সামনে শ্বেত রাজকীয় লোভের মরিয়া প্রতাপের মধ্যে। তারপরে তো এসে পড়ল চীনজাপানের লড়াই, স্পেনে এল সভ্যতার বীরত্ব ও প্রতিক্রিয়ার জোটের কাছে শেষপর্যন্ত লজ্জাকর হার, এল মুসোলিনি হিটলরের ফ্যাসিজম্‌। পৃথিবী হয়ে উঠতে লাগল অসমতার মধ্যেও মনে মনে একটি দুনিয়া।

সাহিত্যিকরা গৌণ জীব হলেও, সাহিত্যিক মানসেও তাই ছন্দ শব্দ, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভাষা হয়ে উঠতে লাগল একাধারে তীব্র এবং ব্যাপ্ত, ব্যক্তিময়তা হতে লাগল একাধারে বিশুদ্ধতর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক এবং সেইহেতু বিশ্বজনীন। উপমা রূপক হতে লাগল প্রতীক—সাঙ্গীতিক ও গাণিতিক বোধহয় বিপরীত দুই অর্থেই, ভাষা যতই পেশীসচল ক্ষিপ্রসন্ধানী ততই প্রাকৃত দেশজ, সাধারণ্যের নিহিত ভাষার ছন্দে বিদগ্ধ, জটিল, পুরুষার্থে সবল সুস্থ।

প্রতিক্রিয়ার উটপাখি নিরাপত্তায় খাসবিলেতে পলাতক হলেও এলিঅট সাহেব ঠিক কথাই বলেছিলেন যে কবিরা কখনও কখনও কবিতা আরম্ভ করতে গিয়ে টের পেয়ে যান যে তাঁর জ্ঞানে ও অজ্ঞানে একটা কিছু ঘটছে এবং যেটার বাইরে গঠন পাবার, মূর্ত হয়ে আসার চাপটাও বোধ করেন। তিনি হয়তো তখনও সম্যক জানেন না সেটা ঠিক কি ব্যাপার ঘটছে, যদিচ তার প্রস্তুতি

হয়েছে তাঁরই মনে। কিন্তু শেষ অবধি যে কবিতা তিনি রচনা করে বসেন, তার সে কবিতাই তাঁকে একটা মুক্তির লঘিমা বোধ দেয়; শিশু যেমন মাতাকে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাটিই হয়তো প্রকাশ করে সেইসব আশাআকাঙ্ক্ষা বা উদ্বেগ-ভয়, সেই সব সংশয় বা আস্তিক অনুভব যাতে তিনি সচেতন-অচেতন ভাবেই অংশীদার বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে এবং দেশের মানুষের সঙ্গে চৈতন্যে ক্রমান্বয়ে উত্তীর্ণ।

উইলিঅম বট্‌লর ইয়েটস্‌ ও বাংলা

'ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্‌ চাপা পড়েন না; তাঁহাকে একজন বিশেষ-কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারিদিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য দেহে মনেপ্রাণে ইহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।"

এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ১৩১৯ সালে চার বছর এক মাসের কনিষ্ঠ আইরিশ কবির বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধটি আরম্ভ করেন। ইংরেজি সেই জর্জীয় যুগেই রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন যে ইয়েটস্‌ অধিকাংশ ইংরেজি কবিদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর কাব্যশক্তি আসে তিনি বাস্তব জগতের কবি বলেই, নিছক সাহিত্যিক লিখিয়ে বলে নয়, যাঁরা আমাদের সঙ্গীত জগতের অনেক ওস্তাদের মতো সঙ্গীত চর্চা করেন সমগ্র সত্তার তাগিদে নয়, শুধুমাত্র প্রচলিত সঙ্গীত জগতের রীতির আদর্শেই।

১৯১২-তে রবীন্দ্রনাথের এই সহজাত বোধ আশ্চর্য বিচারই করেছিল, বিশেষত যখন দেখি প্রবন্ধটির শেষে তিনি নিজেই বলেছেন যে তখনও এই কৃতী আইরিশ বন্ধুর লেখা তিনি কিছু পাঠ করেননি।

বর্তমানে ইয়েটসের সমস্ত এবং বহুবিধ রচনা পাঠকের আয়ত্তে, তার ফলে সঠিক কেন্দ্রায়িত দীর্ঘ আলোকপাতে পাঠ ও বিচার সহজ। এবং এখন আমরা দেখতে পাই কী ট্রাজিকভাবে মহৎ ছিল তার সুচির সেই সাধ যাকে তিনি বলতেন দি গ্রেট্‌ মাদার্‌, বা আদি জননীর সান্নিধ্যে, সংস্কৃতির ঐক্যে, জীবনের অখণ্ডতায় প্রত্যাবর্তনের অভীপ্সা, কারণ তা হলেই লেখা সম্ভব হবে লোক সাধারণের মহাগ্রন্থের জন্যে। তিনি তো জাত-ইংরেজ ছিলেন না এবং তাঁর দৃপ্ত কীর্তি সম্ভব হয়েছিল অনেকটা তাঁর আইরিশ স্বাজাত্য এবং যন্ত্রণাকর আত্মসচেতনতার কারণে।

অবশ্য এ স্বপ্ন সম্ভব ছিল প্রতিভাধরের পক্ষেই, যিনি সম্পূর্ণভাবে ছিলেন এক কবি, কবিমানসের নিঃসঙ্গ কিন্তু সমগ্র ব্যক্তিকতা যাঁর স্বভাবে। কিন্তু আজকাল বোঝা যাচ্ছে যেমন অধ্যাপক শ্রীমতী স্টক্ স্পষ্টই দেখিয়েছেন ইয়েটসের কবিতায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর স্বদেশ আয়ার্ল্যাণ্ড দীব্রে্র, কাথলীনে ফর্গসের, অয়সিনের আয়ার্ল্যাণ্ড যা সর জন এণ্ডারসনের (পরে বাংলার লাট), যা ব্ল্যাক-এণ্ড-ট্যানদের, ষোলটি নিহত মানুষের, ডাক আপিসে চড়াও আক্রমণেরও 'এয়রে' বটে। এই আয়ার্ল্যাণ্ডই সেই সবল মেয়েমানুষটিরও দেশ, সেই এক মাতা যে গৃহদ্বারে শুধু দাঁড়িয়ে না বসে ছিল এবং যাকে অকারণে মেরে ফেলল মাতোয়ালা ইংরেজ পল্টন দল। এবং কবির উপলব্ধি যথার্থ হয়ে উঠল কিভাবে "ভীষণ সৌন্দর্য হয় জাত।" এখন বোঝা যাচ্ছে ইয়েটসের মানসে এই সব অভিজ্ঞতা কতটা অর্থবহ হয়ে উঠেছিল, যেমন আবার হয়েছিল সেই "কেণ্টিক গোধূলি", যা মূলত তৎকালীন সীমার মধ্যে এয়রীয় নবজাগরণই। এবং আইরিশ নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সার্থকতার বিকাশও সেখান থেকেই। এই দূরান্বিত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে ইয়েটস্‌কে আইরিশ ফ্রী স্টেটের সেনেটরের জাগ্রত দায়িত্বে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে বক্তৃতা আলোচনা আমাদেরও মুগ্ধ হতে হয়।

সত্যিই ইয়েটসের দীর্ঘ জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পটে আমাদের কবির "গীতাঞ্জলী" অনুবাদের বইয়ের বিখ্যাত ভূমিকাটি এক নতুন অর্থ পায়, যে অনুবাদগুলির খসড়া তিনি পকেটে নিয়ে বেড়াতেন ও থেকে থেকে পড়তেন। ঐ ভূমিকায় ইয়েটস্ এক জায়গায় লিখেছিলেন, "এই লিরিকগুলি আমার ভারতীয়েরা আমায় বলেছেন, মূল বাংলায়, ছন্দস্-এর ব্যঞ্জনা নৈপুণ্যে, বর্ণাঢ্যতার অনুবাদাতীত সূক্ষ্মতায়, পদ্যমাত্রার বহুবিধ নবত্বে পরিপূর্ণ এবং এগুলিতে চিন্তার যে জগত প্রকাশিত সারাজীবন তারই স্বপ্ন আমি দেখেছি। চূড়ান্ত এক বৈদগ্ধের, এক সংস্কৃতির রূপকর্ম এগুলি, অথচ মনে হয় এরা মাঠের ঘাসের মতো, জলার নল খাগড়ার মতোই সাধারণ্যের মাটিতেই বেড়ে উঠেছে। কাব্য ও অধ্যাত্মধর্মে একাকার এক ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে এই সংস্কৃতিতে চলেছে, উপমা উৎপ্রেক্ষা তথা অনুভূতি ভাব সংগ্রহ করে বিদ্বজন তথা প্রাকৃত-জনের ভাষা থেকে এবং আবার সেই স্রোতকে নিয়ে গেছে পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত জনের চিন্তার বিন্যাসে।

"যদি বাংলার এই সভ্যতা অবিভক্ত থাকে, যদি ঐ মানসিক সাধারণ্য

না—আন্দাজ করি—সর্বব্যাপ্ত, দশ-বিশটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে টুক্‌রো টুক্‌রো না হয়ে যায়—"

কিন্তু, ইয়েটসের 'ভারতীয়েরা' ব্যাপারটা অতিসরল করেছিলেন এবং ঐ যদি-টা মস্ত বড় যদি। রবীন্দ্রনাথের এই বাংলাদেশেও—প্রায় ইয়েটসের আয়ার্ল্যাণ্ডের মতোই with her great hatred and little room—বিপুল ঘৃণায় আর তিক্ত স্থানাভাবে।

এবং ইয়েটস্ ১৯১০-এই লিখেছিলেন :

যা কঠিন, তারই আকর্ষণ—
আমার ধমনী থেকে শুষে নেয় সব রস-কষ,
দূর করে স্বতস্ফূর্তি, সহজ সন্তোষ
আমার হৃদয় থেকে—

তখনই ইয়েটসের কাব্যরীতি, জীবন ছন্দ আর নির্ভীক বাচন পদ্ধতিতে যে একটা শক্ত পেশল অনমনীয়তা এসেছে তাতে মনে হয় যে তিনি তাঁর তারুণ্যের কেল্টিক স্বপ্ন থেকে পাকাপাকি ভাবে বেরিয়ে পড়েছেন, এবং ঢুলুঢুলু চোখে ইঙ্গফরাসী প্রতীক বাদ বা সাইমনসের পেটার ছাঁচের শৌখিনতা তখনই অতিক্রান্ত। বস্তুত ইয়েটস্ সেই যুগেই পাউণ্ড এলিঅটদের মতো নবীন আধুনিকদের পুরোভাগে। আশ্চর্য রকম আত্মসচেতন কবি জীবনের প্রথমার্ধে নাটুকেপণা বা পের্সোনা বা ব্যক্তি স্বরূপের সচেতন রূপ রং সন্ধানের অস্থিরতা এই কারণেই তাকে বিড়ম্বিত করত। কিন্তু ঐ কারণেই তাঁর ব্যাপক ও গভীর নানারকম সমালোচকমনা উপলব্ধি শতবার্ষিকীর পরেও আমাদের মনন উদ্রেক করে। দীর্ঘায়ু ও ক্লান্তিহীন প্রয়াসের ফলে তাঁর আপাত দৃষ্টিতে কল্পনোদ্‌ভ্রান্ত ও পথে পথে ভ্রাম্যমান চিন্তার, তথা সংলগ্নতার কাব্যের ও নাটকের বিবর্তনে একটা একসূত্র সন্ততি আজ দেখা যায়। ইয়েটসের কৃতবিদ্য পিতা তাঁকে ঠিকই সাবধান ক'রে দিতেন, সত্যিই ইয়েটস্ দার্শনিক ছিলেন না, তিনি এক মহাকবি মাত্র, অনেক তাঁর মুখচ্ছদ, ব্যক্তিস্বরূপের নানান মুখোশ এবং তথাকথিত দর্শন ও অপদর্শনের তত্ত্ব তিনি ব্যবহার করেছেন বস্তুতপক্ষে তাঁর কবিত্বকে অবলম্বন দেবার জন্য।

ভারতীয় নিগূঢ় অধ্যাত্মতন্ত্রের চিন্তা তাঁকে টানে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্থূল বস্তুবাদের জয়জয়কারের প্রতিবাদে প্রতিক্রিয়ায় এবং হয়তো কিছুটা অসাধারণ মোহিনী চাটুজ্জের মতো ভারতীয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে, সেই ১৮৮৬-তেই।

প্রসঙ্গত একটি চালু ভারতীয় চিন্তার বিষয়ে তাঁর এক কাঁচা বয়সের বিলাসী কবিতার সঙ্গে যে কবিতাটি তিনি পরিণত কবিত্বে তাঁর যৌবনের গুরুর বিষয়ে লেখেন তার বাঙ্ময় নিশ্চিতির তুলনাটা। Kanva on himself ছাপা হয়—মজাটা, লক্ষ্য করুন, ১৮৮৮-তে The Vegetarian বা নিরামিষাশী নামক এক পত্রে—

Now wherefore hast thou tears innumerous ?
Hast thou not known all sorrow and delight
Wandering of yore in forests rumorous,
Beneath the flaming eyeballs of the night,

And as a slave been wakeful in the halls .
Of Rajas and Maharajas beyond number ?
Hast thou not ruled among the gilded walls ?
Hast thou not known a Raja's dreamless slumber ?

এবং আরো দুটি সুইনবর্নীয় বিলাসভারাক্রান্ত চতুষ্পদীর পরে :

Then wherefore fear the usury of Time,
Or Death that cometh with the next life-key ?
Why, rise and flatter her with golden rhyme,
For as things were, so shall things ever be.

মোহিনী চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বিষয়ে কবিতাটি প্রায় একসঙ্গে লণ্ডন মর্করিতে আর ১৯৩১, ১৪ই জানুআরির নিউ-রিপবলিক্ পত্রে Meditations upon Death নামক দীর্ঘ কবিতার অংশরূপে ছাপা হয়। মনে আছে একদিন আমার বাবার কাছে সমাগত দৃষ্টিহীন মোহিনীবাবুর সংযত, খুশীভাবটা যখন পিতৃআজ্ঞায় কবিতাটি আমায় পড়ে শোনাতে হল, এবং সাপ্তাহিকটি তিনি তাঁর পুত্রের জন্যে নিয়েও গেলেন :

উপাসনা করব আমি কি না,
আমার এ প্রশ্নের উত্তরে
ব্রাহ্মণ বললেন আমায় :
"কোরো না কিছুই প্রার্থনা
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়,

"আমি তো ছিলাম মহারাজ,
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
ছনিয়ায় কিছু নেই আজ,
মূর্খ জুয়াচোর বা বদমাশ
আমি যা হই নি একবার,
অথচ আমার বক্ষ'পরে
লক্ষ মাথা রেখেছে তো ভার।"

বালকের চণ্ড দিন রাত
যাতে হয় প্রশান্ত অন্তথা,
মোহিনী চ্যাটার্জি বললেন
ঐ বা অমনিতর কথা :
আমি জুড়ি টীকার ব্যাখ্যানে,
"বৃদ্ধ প্রেমিকেও পেতে পারে
কাল যা দেয়নি এতকাল—
মিটবে তাদের সাধ, তাই
কবরে করব গাদা করে,
ছনিয়ার আণ্ডার জমিনে
চিরস্থায়ী ফৌজের কাওয়াজ,
জন্মের গাদায় জন্ম জমে
যাতে ঐ কামান দাগার
আওয়াজেই ত্রিকাল পালান্,
জন্ম মৃত্যু লগ্ন মিশে যায়,
অথবা ঋষিরা যা বলেন,
মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়॥

ইয়েটস্ নিজেই তাঁর Commentary on Supernatural songs-এ বলেন যে তিনি প্রথমপর্বের খৃস্টীয় আয়ার্ল্যাণ্ড-কে ভারতের স্বগোত্র ভাবতেন এবং কৈলাস পর্বত ও মানস সরোবরের তুল্য তিনি প্রাচীন আয়ার্ল্যাণ্ডে পেয়েছেন?

একালের বাস্তব আয়ার্ল্যাণ্ড-এর কথায় এলে দেখা যায়, ইয়েটস্ও বহু মহান আইরিশম্যানদের মতো মুষ্টিমেয় ভদ্রলোক শ্রেণীরই মানুষ, প্রটেস্টান্ট

ইংরেজের শাসনে ক্যাথলিক দেশে অল্প কয়েকজন স্বদেশ প্রেমিক প্রটেস্টান্ট সমাজের প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁদের মনস্থির করতে হয় এবং ঘোষণা করতে হয় ইয়েটসের ভাষায় :

আমি আয়ার্ল্যাণ্ডেরই
পুণ্যভূমি আয়ার্ল্যাণ্ডেরই।

একদিকে দেশবাসীর দীর্ঘ এবং মহৎ এক ঘৃণা, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন মননশীলের স্বকীয় গর্ব, তারই মধ্যে আইরিশ ভাষায় অজ্ঞ ইয়েটস্‌কে শক্তি সঞ্চয় করতে হয় নিজের সমুচ্চ কল্পনালালিত আইরিশ্‌রিতে। এমন কি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তাঁর স্বদেশের তরুণ তরুণীদের কাছে বলেন—

Cast your mind on other days
That we in coming days may be
Still the indomitable Irishry.

এই মনোভাবেই তিনি তাঁর কবর-নামা লেখেন—

Under bare Ben Bulben's head
In Drumcliff churchuyard Yeats is laid.—এবং তাঁর

একাধিক জোরালো প্রতীকের অন্যতম, ঘোড়সওয়ার-কে ৪/৯/৩৮-এও হুকুম দিতে পারেন :

হিম চক্ষু মুহূর্তেক দাও
জীবনে, মরণে, আর
ঘোড়সওয়ার, পাশ কেটে ধাও।

অবশ্যই তিনি জানতেন অস্থি সর্বস্ব বৃদ্ধ ব্যক্তি হওয়া কাকে বলে; বস্তুত-পক্ষে, তিনিই বোধ হয় বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ কবি, লীভিসের সমালোচনার সংশোধনে এলিঅট যে কথাটা বলেছিলেন :

এখন যে আমার সে মইটা উধাও
আমায় শুতেই হবে সব মই শুরুই যেখানে
হৃদয়ের নোংরা ন্যাকড়া হাড়ের দোকানে।

ইয়েটসের ভাষণ-উচ্চতা বা প্রকাশ্য কণ্ঠস্বর হয়তো কাব্যের নিভৃতিবাদী পাঠকের মনে হতে পারে আলঙ্কারিক আবৃত্তিতে মহাকবির সচেতন প্রয়াস to make the Centre hold—কেন্দ্রকে অচ্যুত রাখার চেষ্টা। অথচ অতি সুকুমার এক কবিমানসের ভয়ানক ট্রাজিক ভাষা এল তাঁরই কবিতায় যিনি

"বরাবর মূলত ব্যবসায়ী চাকুরিয়া শ্রেণীর সংস্পর্শ থেকে যদিচ সর্ব শ্রেণীর থেকে নয় সিঁটিয়ে" থেকেছেন। ভিক্টোরীয় ব্রিটিশ স্থূলতা, তা সে ধর্মাধর্ম বিষয়েই হোক বা বিজ্ঞান বিষয়েই হোক তাঁর সময়ের পজিটিভিস্ট, ইউটিলিটেরিআন্, মরমিয়া বিরোধী ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত সমাজ থেকে তরুণ কবি মুক্তি খোঁজেন স্বদেশের দুর্গত জেলে, চাষীদের মধ্যে, তাদের কাহিনীতে গানে কাছেই দিয়ে ইয়েটসের সুপরিচিত কবিতা Down by the Salley Gardens লিখিত হয় এক গ্রাম্য বৃদ্ধার মুখে শোনা গানের অনুপ্রেরণায়, যদিচ ইয়েটস্ নাকি ছিলেন টোন্-ডেফ্ অর্থাৎ শ্রুতিবোধ বঞ্চিত। তাঁর আইরিশ ভাষাও ছিল তাঁর অজানা,—যে গানটি ক্যাথলীন ফেরিআর-গীত রেকর্ডে অনেক পরে শোনা গেছে।

তাই তো নিঃসঙ্গ মিনারের মহাকবির সাধ ছিল লোকসাধারণের গ্রন্থ প্রণয়নের, তাই তিনি ভাবতেন আর ঘুরে ফিরে বলতেন জীবনের ও শিল্প-সাহিত্যের, সংস্কৃতির অখণ্ডতার কথা। এই দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ডতার অতৃপ্ত সাধই নিশ্চয় তার এক সময়ের রবীন্দ্র উৎসাহের একটা কারণ ছিল। কেন তাঁর রবীন্দ্রনাথে আগ্রহ কমে গেল আর পাউণ্ডের মতো তিনিও বলতে লাগলেন ড্যাম ট্যাগোর সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে পরে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যহীন সাধুসন্তমার্কা ইংরেজি রূপে ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে তাঁর উৎসাহের একটা কারণ অবশ্য ছিল তাঁর ধারণাটাই—বাংলার সভ্যতার অপরিবর্তনীয়তা এবং ঐ সাধারণ্যব্যাপ্ত মানস। রাজনৈতিক তুলনীয়তাও নিশ্চয়ই তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। ১৯৩৭-এ ও তো তিনি লেখেন :

John Bull has stood for Parliament,
A dog must have his day,
The country thinks no end of him,
For he knows how to say,
At a beanfeast or a banquet,
That all must hang their trust
Upon the British Empire,
Upon the Church of Christ.

The ghost of Roger Casement
Is beating at the door.

John Bull has gone to India
And all must pay him heed,
For histories are there to prove
That none of another breed
Has had a like inheritance
Or sucked such milk as he,
And there's no luck about a house
If it lack honesty.

The ghost of Roger...etc.

ইয়েটস্‌কে গড়তে হয়েছিল সে সময়ের বীরত্বময় আইরিশ রাজনীতি নিয়ে কাব্যিক মিথ বা একটা পৌরাণিকত্ব। তাই পিআর্স, কনোলি ও ও' রাহিলি এবং অনুরূপ অনেকে ইয়েটসের কাব্যে বলেন ইয়েটসীয় গোলাপ গাছেরই কথা। বস্তুত, ইয়েটসের অতীন্দ্রিয়-কাব্যিক রোজ্‌ প্রোথিত হয় রক্তপাতে:

There is nothing but our own red blood
Can make a right Rose Tree.

এক হিসাবে ইয়েট্‌স্‌ বরাবরই নানাপ্রকার লিখতে চেয়েছেন:

স্বজাতির আর সত্যের তাগিদে—১৯১৬-র এবং তার পরবর্তী ক'বছরের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর একেবারে অন্তিম কবিতাবলীতেও তাই ছায়া ফেলে। সেটা যে শুধুমাত্র কবিতা লেখার সুযোগের জন্যে নয়, তা বেশ বোঝা যায় মার্কিন যুবা পণ্ডিতের কষ্ট সংগৃহীত সক্রিয় সেনেটর ইয়েটসের বহু বাস্তব বিষয়ে সজাগ বক্তৃতাগুলিতে, বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিকত সজাগ তীক্ষ্ণ ভাষ. মন্তব্যে,—যদিও সাম্যবাদে তাঁর ভয় যায় নি, বরং একটা অপরিচ্ছন্ন আকর্ষণ ছিল কিয়দ পরিমাণে ফাসিসমের প্রতি—অপ্রবীণতর এজ্‌রা পাউণ্ডের মতো।

অথচ কবিতার বিবেচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন: এ কথাও বলা যায় কবিতা বা পদ্যকে যদি পুনরায় মানবিক হতে হয় তাহলে তাকে ধরতে হবে কর্কশ চড়াসুর।

প্রায় পরিণত ত্রিশ বছর ধ'রে তাঁর কাব্য এই প্রবল মানবিকতার সন্ধান।

এমন কি খৃষ্টিয় 'আটত্রিশ সালেও তিনি জানতেন যে বাসনাকামনা আর রাগই তাঁকে গাইয়েছে। এই মেজাজেই তাঁর কবিত্বের আশ্চর্য বিকাশ। কেউ কেউ মনে করেন যে মাঝে একটা ছেদও আছে, কেউ বা বলেছেন যে রীতির পরিবর্তনটা এল প্রায় পঞ্চাশ বছরে বিবাহের পরে। খানিকটা হয়তো তাই কিন্তু ইয়েট্স্ কাব্যের একটা ক্রমিকতাও আছে এবং ১৯১০ এর "গ্রীন হেলমেট" উভয়দিক থেকেই এক সীমা চিহ্ন। আবার পাউণ্ড এলিঅটের মতো কিছু উদ্বাস্তু তরুণদের আধুনিক কাব্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গেও ইয়েট্সের প্রগতির সম্পর্ক আছে। ইয়েট্সের কবি স্বভাবই চাইত নানান্ মুখোশ নিজের স্টাইল অর্জন করতে। নিজেকে তিনি কি বলেন নি যে লোক লেখক মাত্র, কর্মী নয়, তার আত্মজয়ই হচ্ছে স্টাইল (এবং একটি নামহীন কবিতায়, এক চৌপদীতে কবিই তো বলেছেন) কেন তিনি বারবার তাঁর গানগুলি পুনর্নির্মাণ ক'রে যান—ক'রে যান নিজেকেই পুনর্গঠিত করতে। ইয়েট্সের নিজের প্রতিমূর্তি বা ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমিক সংলগ্নতা—যার প্রমাণ আমরা এখন পাই মার্কিন পণ্ডিতের পরিশ্রমে তাঁর কবিতার ভ্যারিওরম সংগ্রহে এবং নাটক সংগ্রহে আর সমস্ত গদ্যরচনার সংগ্রহে। তাঁর সেই বিখ্যাত পয়লানম্বর বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত কবিতা An Irish Airman foresees his Death। এখন তাই তুলনা করা যায় মরণোত্তর প্রকাশিত Reprisals-এর সঙ্গে :

Some nineteen German planes they say
You had brought down before you died.
We called it a good death, Today
Can ghost or man be satisfied ?

Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.

তুমি গোটা উনিশ জর্মান প্লেন, ওরা বলে,
ভূমিসাৎ করেছিলে অকালে তোমার মরণের আগে
আমরা বলেও ছিলুম, মহৎ মরণ। আজ কোন ছলে
প্রেত বা মানুষ কার মনে তৃপ্তি লাগে ?

সুতরাং কান ঢেকে ধুলায় মাটিতে পড়ে থাকো
প্রবঞ্চিত মৃতদের ভিড়ে।

ভাষার কর্তৃত্ব তাঁর ছিল, তিনি জানতেন নিজের কৃতিত্বের মূল্য, তাই তিনি প্রথম বয়সের কবিতাবলী পালটাতেন, যৌবনোচিত প্রয়াসে লজ্জিত হয়ে নয়, তাঁর গোটা কাব্য সংগ্রহের একটা সমগ্রতা আনবার জন্যেই। হ্যাঁ, ইয়েটসের ছিল বটে এক কর্তামশায়ের চরম গর্ব নিজের পছন্দ-অপছন্দে। তাই তিনি বিনা সংকোচে দারুণভাবে স্বকীয় অক্সফোর্ড বুক অব মর্ডাণ ভর্সে গোগার্টিকে সতেরোটি, ডবলিউ জে টর্নরকে বারোটি, লেডি ডরথি ওয়েলেসলিকে আটটি, মাইকেলফীল্ডকে ন'টি, মার্গো রুডককে ছ'টি, এলিঅটকে মাত্র সাতটি, হার্ডিকে মাত্র চারটি তাঁর শ্রীপুরোহিত স্বামীজিকে তিনটি এবং নিজেকে চোদ্দটি কবিতা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথেরও তিনি সাতটি কবিতানুবাদ নিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যাহত আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ ছিলেন ইয়েটস্ এবং তাই কি তাঁর কীটস—বর্ণিত ইগোটিস্‌টিকল্ সব্লাইম অহম নির্ভর মহত্ত্ব শেষ অবধি তাঁকে তাঁর নেগেটিভ কেপেবিলিটি অহম বিসর্জমান সমশক্তিসত্তা অর্জনে সফল হল? তিনি তাঁর ভাবাবেগ-কে জাদুবলে দাঁড় করাতে পারতেন ইওরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতীকবাদীদের চেয়ে ভালেরি রিল্‌কে বা পাস্টেরনাক—চেয়ে বেশি সার্থকতায় প্রাণময়তায়। তাই বৃদ্ধ ইয়েটস্ সোজা লিখতে পারতেন তাঁর জানালার পাশে ময়নার বাসার বিষয়ে কবিতা:

আমরা সব অবরুদ্ধ, আমাদের অনিশ্চয়তার
কপাটে পড়েছে চাবি, পথে ঘাটে ঘরে
কেউ বা হয়েছে খুন, কারো ঘর পুড়ে ছারখার।
অথচ নিশ্চিত তথ্য স্পষ্টত বোঝাই হল ভার।
এসো বাসা বাঁধি পরিত্যক্ত এই ময়নার কোটরে।

সেই জন্যেই বৃদ্ধ কবি মৃত্যুর কিছুকাল আগেও ভাবনাচিন্তা করেন বালক-বালিকাদের শিক্ষাবিষয়ে, যে প্রবন্ধেই তিনি প্রসঙ্গত লেখেন: "ইংলণ্ড জোর করে ভারতে শিক্ষাদীক্ষায় ইংরেজিভাষা চাপিয়েছে এবং আজও কোনো ভারতীয়ই কয়েকপুরুষ ধ'রে ইংরেজি শিক্ষা চালিয়েও প্রাণবন্ত ইংরেজি লিখতে বলতে পারে না এবং তার মাতৃভাষাই হয়েছে তাই ঘৃণিত এবং দূষিত।"

রবীন্দ্রনাথ, ইয়েটস্‌, পাউণ্ড

"ইংলণ্ডের বর্তমানকালের কবিদের (তারিখটা হচ্ছে ১৯১২) কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইহাদের অনেককেই আমার মনে হয়, ইহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন, ইহারা সাহিত্যজগতের কবি। এদেশে অনেকদিন হইতে কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে কবিত্বের জন্য কাব্যের মূল প্রস্রবণে মানুষের না গেলেও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসেনা, কথা হইতে কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয়না; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা প্রমাণের জন্য কেবলই তাহাকে অদ্ভুতের সন্ধানে ফিরিতে হয়।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে স্বইনবর্ণের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ হইবে।..."

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সাড়ে এগারো পৃষ্ঠার আশ্চর্য প্রবন্ধটি থেকে ইতিমধ্যেই একপৃষ্ঠা উদ্ধৃত করে ফেলেছি। সংক্ষেপের চেষ্টায় আপনাদের স্মরণ করাই যে অতঃপর আমাদের কবি বলেছেন যে:

"কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি য়েটস্ যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন তাহারও গোড়ার কথাটা ঐ।" সেকালের স্কচ বর্নস্-এর মতো একালের আইরিশ কবির কবিতাও "কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে। ঐ যে 'নিজের হৃদয়' বলিলাম ও কথাকে একটু বুঝিয়া লইতে হইবে। হীরার টুকরো যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশই পায়না, সেখানে সে অন্ধকার।......"

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কথা অন্তর্দৃষ্টিতে বিস্ময়করভাবে গভীর সত্য, তিনি বলেন: "কবি য়েটসের কাব্যে আয়ার্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।"—বিস্ময়কর-ভাবে গভীর, কারণ প্রবন্ধের শেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "তিনি যে কবি, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার সুযোগ এখনও আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার চতুর্দিকে প্রাণবানরূপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অনুভব করিতে পারিয়াছি।"

এই ১৩১৯ বাংলা বছরের ভাদ্রমাসের প্রায় সমকালেই ইয়েটস্ পড়ছিলেন 'গীতাঞ্জলি' নামক রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের বা গীতিকবিতার ইংরেজিতে কবিত্বময় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেকাংশে সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ। এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লেখা ইয়েট্সের বিখ্যাত ভূমিকাটি আপনাদের জানা। তার দ্বিতীয় পর্বে তিনি লিখছেন: "দিনের পর দিন আমি এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বেড়িয়েছি; রেলে, বাসের মাথায় বা রেস্তোরাঁতে বসে পড়েছি। পাছে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি দেখে ফেলে আমি এতে কত বিচলিত তাই অনেক সময় আমাকে পাণ্ডুলিপি বন্ধ করতে হয়েছে। ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে মূল বাংলায় এই গীতিকবিতাগুলি পদ্যমিলের সূক্ষ্মতা, রঙের অননুবাদ্য কমনীয়তা এবং ছন্দের উদ্ভাবনে পরিপূর্ণ—আমি সারা জীবন যে জগতের স্বপ্ন দেখেছি এদের ভাবে তা প্রকাশিত। মহত্তম সংস্কৃতির অবদান হলেও ঠিক তৃণ ও শবের ন্যায় সাধারণের মাটিতে এর জন্ম। তা এমন একটি ঐতিহ্য যাতে কাব্য ও ধর্ম অভিন্ন, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী শিক্ষিতের অশিক্ষিতের রূপক ও ভাবাবেগ পরিগ্রহণ করেছে এবং আবার বিদ্বজ্জনের, সম্ভ্রান্ত মনের চিন্তাকে বিপুল লোকায়তে বয়ে নিয়ে গেছে। বাংলার সভ্যতা যদি ভেঙে না যায়, যদি সেই পূর্বোদ্ধৃত সাকল্যে বাঁধা একটি সার্বজনীন মন আমাদের মত পরস্পরের অজানা বারোটি মনে টুকরো না হয়, তবে কয়েক পুরুষের মধ্যে এই কাব্যমালার যা সূক্ষ্মতম উপচার তা পথের ভিখারীর কাছেও পৌঁছবে। ইংলণ্ডের মনের ঐক্য থাকার সময়ে চসার ও ট্রয়লাস ক্রেসিডা লিখেছিলেন; আমাদের কাল ঘনিয়ে আসছিল বলে তিনি পড়বার ও পড়ে শোনাবার জন্য লিখলেও কিছুদিন তাঁর কবিতা চারণকণ্ঠে গীত হয়েছিল। চসরের পূর্বগামীদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথা দিয়ে সঙ্গীত রচনা করেন এবং প্রতি মুহূর্তে বোঝা যায় যে তিনি এত উচ্ছল, স্বতঃস্ফূর্ত, আবেগে নির্ভীক,

আর বিস্ময়করতায় পূর্ণ, কারণ যা তিনি করছেন তা কখনো অচেনা, অপ্রাকৃত বা সাফাই-এর অপেক্ষায় থাকছে মনে হয় না। এই কবিতাবলী ছোট ছোট সুমুদ্রিত বইয়ের আকারে সেই সব মহিলাদের টেবিলে পড়ে থাকবে না, যাঁরা নিজেদের নিরর্থক জীবনের সম্পর্কে দীর্ঘশ্বাস ফেলার জন্য অলস হাতে পাতা ওল্টান, ঐ যথাসর্বস্বের সীমাতেই তো আবার তাঁদের জীবনকে জানার যা কিছু সাধ্য। কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এই কবিতাবলী নিয়ে ঘুরবে না যা তাদের কর্মজীবনের সূচনাতে সরিয়ে রাখতে হয়। রাজপথের পথিকরা এবং নদীর বুকের মাঝিরা এই 'গীতাঞ্জলি'র গান গুঞ্জন করবে। পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষমান প্রেমিক-প্রেমিকারা এর অস্ফুট উচ্চারণে, এই ঈশ্বরপ্রেমে এক মায়াময় সায়রের সন্ধান পাবে যাতে তাদের মর্মান্তিক আবেগ শুদ্ধস্নাত হতে পারে এবং তার যৌবনকে নতুন করে গড়ে তোলা যায়। প্রতি মুহূর্তে কবির হৃদয় অবজ্ঞা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকেও এদের দিকে প্রবাহিত হয় কারণ সে হৃদয় জানে তারা বুঝবে এবং তাদের জীবনের অনুষঙ্গে তা নিজেকে ভরে নিয়েছে। পাছে ধূলিমলিন দেখায় তাই গেরুয়া বসনে সজ্জিত পথিকটি, শয্যাতলে প্রেমিক রাজার ছিন্ন মালার খোঁজে বালিকা, শূন্যঘরে প্রভুর আগমনের জন্য সেবিকা বা বধূর প্রতীক্ষা —তারা সব ঈশ্বরাভিমুখী হৃদয়ের ভাবমূর্তি। সেই হৃদয়ের বিরহ-মিলনের ভাবে গড়া চিত্রকল্প ফুল ও নদী, শঙ্খধ্বনি, শ্রাবণের ঘন বর্ষা বা প্রখর তপন-তাপ, আর চীনা ছবির রহস্যমণ্ডিত মূর্তিগুলির ন্যায় মানুষটি যে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে স্বয়ং ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। আমাদের কাছে অনন্ত অচেনা একটি সম্পূর্ণ জাতি, একটি সমগ্র সভ্যতা এই কল্পনায় গ্রথিত। তবু আমরা এর অচেনা ধরণের জন্য নাড়া পাই না। নাড়া পাই কারণ এতে নিজেদের ভাবমূর্তির দেখা পেয়েছি, ঠিক যেন রসেটির উইলো বনে বেড়িয়ে এলাম বা সাহিত্যে হয়ত এই প্রথম স্বপ্নের মধ্যে আমাদের কণ্ঠস্বর শুনলাম।"

॥ ২ ॥

বস্তুতঃ ইয়েটস্ বরাবরই খুঁজছিলেন, যাকে তিনি বলেন, the common mind, জাতীয় মানস, সাধারণের মানস—সংস্কৃতির ঐক্য, the unity of culture, খুঁজছিলেন the unity of life, জীবনের ঐক্য; লিখতে চাইছিলেন এমন এক সূত্রে বাঁধা কবিতা যা স্থান পেতে বা সংযোজিত হতে পারে the book of the People-এ—জাতির জনসাধারণের গ্রন্থে। এবং অন্যান্য

কারণের মধ্যে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' পাঠে এবং বাংলাদেশ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দেশভক্ত ও রবীন্দ্রভক্ত বাঙালীদের কথাবার্তায় তাঁর মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতি সেই দুরূহ সিদ্ধিলাভ প্রায় স্বতঃই করেছে যা পশ্চিম ইওরোপে একালে অসম্ভব এবং যা ইয়েটস্‌কে আজীবন আহ্বানে আহ্বানে অস্থির করেছিলো।

অবশ্য ইয়েটস্‌ যে এই রাবীন্দ্রিক বঙ্গীয় সত্যাসত্যমিশ্র তত্ত্বটির জন্যই আমাদের কাছে সেকালে সমাদর লাভ করেন তা নয়। রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি মুগ্ধপ্রশংসা করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদিগ্বিজয়ের সূত্রপাতে যে এই প্রশংসামূলত চেষ্টার কিছু মূল্য ছিল, আমরা তাতেই ইয়েটসের খুব ভক্ত হয়ে গিয়েছিলুম, তাঁর কবিতা সেই অনুপাতে না পড়েই।

এবং যেটুকু পড়েছিলুম তাতে আমাদের অস্পষ্ট আবেগভুক ও কল্পনাবিলাসী মন সহজেই পরিতৃপ্তি খুঁজে পেত। সেকালের ইয়েটস্‌ আমাদের কাব্য-সাহিত্যের সাহিত্যিকমন্যতা বা শৌখীনতার জগতে এক মহাজন আত্মীয় ছিলেন। পরে যখন ১৯১২-র পর থেকে ইয়েটস্‌ ক্রমান্বয়ে তাঁর কাব্যময়তায় ভারাক্রান্ত বলা যায়, সুইনবর্ণীয় কাব্যের মেজাজকেও রূপকে রূপান্তরিত বিকশিত করতে লাগলেন এক পেশল সামর্থ্যবান ছন্দে, ভাষায়, পরুষ কর্কশ তীক্ষ্ণ তীব্র এমন কি আমাদের রাবীন্দ্রিক রুচির পক্ষে সময়ে সময়ে নির্লজ্জ বাস্তবনির্ভর রীতিতে, তখন আমাদের খুল্লতাতরা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতারা হয়তো পীড়িতই বোধ করতেন।

বিশ দশকের মাঝামাঝি দিক থেকে আমার মতো অর্বাচীনের তাই মনে হত যে প্রথম দিককার ইয়েটস্‌ আসলে নিজের তথা আয়ার্ল্যাণ্ডের হৃদয় থেকে কাব্য রচনা করেন নি। রচনা করেছিলেন কাব্যরচনার তাগিদে, কাব্য-বিলাসী কবিযশঃপ্রার্থীর আবেগে। মনে হত তাঁর কাব্যে মুখ নয়, মুখোশ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, ব্যক্তিস্বরূপ নয়, personality নয়, persona মাত্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে রাবীন্দ্রিক জলহাওয়ায় মানুষ আমাদের কাছে শেষ অবধি প্রচলিত একরকম দেশী রোমান্টিক প্রবণতাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ আমরা কাব্যে চেয়েছি হৃদয়ের আত্মপ্রকাশ—look into thine own heart and write এবং তাকেই বলেছি সততাময়, আন্তরিক, প্রাণময়। এবং শ্রমসাধ্য, নৈর্ব্যক্তিক অথবা ব্যাজোক্তিময় বা দ্বিধান্বিত ব্যঙ্গের গভীরতা বা দ্ব্যর্থময় আয়রণি বা উইট্‌-কে অপছন্দের চোখে দেখেছি। ভাষাতে কাব্যোচ্চারণে

আবৃত্তিতেও আমরা চেয়েছি নাটকীয় গলাকাঁপানো ও স্বরদীর্ঘায়িত এক ওতপ্রোত নিরবচ্ছিন্ন আবেগময়তা। ফলে সেকালে যখন হর্বার্ট রীডের মত নব্যসমালোচকও কবিদের দুইভাগে বিভক্ত পঙ্‌ক্তিতে বসান—পার্সন্তালিটি ও ক্যারাক্‌টরসম্পন্ন দুটি স্বতন্ত্র জীব, তখন সে ভাগ মনে হয়েছিল খুবই স্বাভাবিক। অথচ একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় যে ঐ দুই নাম শুধুমাত্র মনস্তত্ত্বের কাজকর্মের সুবিধার জন্যই প্রযোজ্য, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। অর্থাৎ, চার্লস উইলিআমস্ না পড়েও মানতে হয় মিলটন্‌কে ক্যারাকটর-প্রধান বলে বাতিল করা যায় না, যেমন যায় না ড্রাইডেন-পোপদের। এবং আমাদের সৌভাগ্য যে চোখের সামনে আমরা দেখেছি আশি বছর অবধি ঐ দুই মনোলক্ষণের বা ঝোঁকের পরম ঐক্যে মিলিত জয়যাত্রা রবীন্দ্রনাথে, যাঁর সমগ্র জীবন ও রচনাবলী পার্সন্যালিটি ও ক্যারাকটরের একযোগে হরগৌরী-সিদ্ধি।

কিন্তু আমাকে এবার ইয়েটসের কাব্যে ফিরে আসতে হবে। ইয়েটসের কাব্যের প্রথম দিকে এবং প্রাথমিক সব ভাষ্যে আবেদনটা ছিল একটা অস্পষ্ট মরমিয়া আধা-রোমান্টিক আধা-প্রতীকবাদী স্বপ্নালুতার মূর্তিরচনার আবেদন। অল্পবয়সে এই আবেদন বেশ বিচলিত বিহ্বল করাটাই স্বাভাবিক, বাংলা কবিতায় তার পরোক্ষ সাক্ষ্য কিছু মিলতে পারে—'বেনু ও বীণা' থেকে 'ঝরা পালকে'র উদাস-করা সুরে।

ইয়েটস্ যখন নিছক নৈর্ব্যক্তিক বিষয়, যথা ক্যথলীন বা দীর্দ্রে, অয়সিন বা ফগর্সদের-দের নিয়ে হ্রস্ব বা দীর্ঘ কবিতা রচনা করতেন তখনও এই স্বপ্নালুতার আমেজ কাহিনীব্যাখ্যানেও জড়িয়ে থাকত। কারণটা নিশ্চয়ই কবির একার তৎকালীন বিশেষত্বে, এবং সেই সময়ের কাব্যযুগধর্মেই, একদিকে কেলটিক স্বদেশিয়ানার কাব্যিক মেজাজেই এবং অপরপক্ষে প্যারিসীয় বায়ুসেবিত লণ্ডনের কবিদের মেজাজেও।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক কথাই বলেছিলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের হৃদয় ইয়েটসের কবিসত্তাকে বাস্তবহৃদয়বত্তা দিয়েছিল। এবং এই স্বদেশচৈতন্য থেকে যে খানিকটা অন্ততঃ ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথের কবিকীর্তিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য যে সংহতির কথা, সর্বব্যাপ্ত ঐক্যের কথা তাঁকে রবীন্দ্রভক্ত ও স্বদেশভক্ত বাঙালীরা শুনিয়েছিলেন, সেটা হয়তো অত্যুক্তিমূলক হয়েছিল কিন্তু সেই স্বদেশী যুগের জয়লাভের পরে

১৯১২-তে ঐ অত্যুক্তিতে নিশ্চয়ই সত্য দেখা যেত সহজে এবং অনেক বেশি,—অনেকপরে ১৯৪৭-এ আমাদের জ্ঞানলাভ হল মারাত্মক সত্যাসত্যের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

মূল কথাটা হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতায় ঐশ্বর্যময় ও গর্বিত একটা জাতি যখন অন্যের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়, তখন তার আত্মসচেতনতায় তীক্ষ্ণ স্বজাতীয়তা তার কবিদেরও ক'রে তোলে বিস্তৃতভাবে ও গভীরভাবে ব্যক্তিগত তো বটেই, ব্যক্তিগতের উর্ধ্বেও আত্মসচেতন। তাতে মুখ বাধ্যতই হয়ে যায় মুখোশ। একরকমের মুখোশই কি আমরা পাই আইরিশ স্বাধীনতাযুদ্ধের যুগের অনেক আগেই ডীন সুইফটের সর্বনাশা ব্যঙ্গে? তিনিই তো ইংলণ্ডের মাংসখাদ্যসমস্যা নিরাকরণের সাধু নিদারুণ চেষ্টায় লেখেন যে যদি ইংরেজপ্রভুরা আয়ার্ল্যাণ্ডের সমস্ত শিশুদের কোমলমাংস নিজেদের খাদ্য সরবরাহে লাগান, তাহলে মাংসাভাবে ইংরেজের ভোজনকষ্টও থাকে না এবং অধিকন্তু অদূর-ভবিষ্যতে কোনও রাজনৈতিক আইরিশ সমস্যাও আর কণ্টকবৎ ইংরেজকে বিদ্ধ করবে না।

এদিকে ইয়েটস্‌ও অন্যান্য অধিকাংশ মহান্ আইরিশম্যানদের মতো দেশের জনসাধারণ থেকে ছিলেন বিচ্ছিন্ন; মধ্যবিত্ত, বা জমিদার, ইংরেজিভাষী, ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রটেস্টান্ট—যেন হিন্দুমুসলমানের দেশে হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্ম কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মানুষ,—এবং এই প্রাটেস্টান্টরা আবার ধর্মগতভাবে ইংরেজ রাজাদেরই সহধর্মী। তাই তো ইয়েটস্‌কে মনঃস্থির করতে হয় এবং সরবে বলতে হয়:

I am of Ireland
The Holy Land of Ireland—

যে আয়ার্ল্যাণ্ডের মূর্তিতে মহৎ ও দীর্ঘ চারশো বছরের ঐতিহ্যে ছিল অগণিত মানুষের ঘৃণা ও রাগ, যাতে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও প্রকৃতপক্ষে বললাভ করেছিল তাঁর নিজের মনীষার ও কবিপ্রতিভার বিচ্ছিন্নতার নিঃসঙ্গতার গর্ব। কোনও ইংরেজ কবির পক্ষে ঐরকম ভাবতে বা বলতেই হয়নি যে তিনি ইংল্যাণ্ডের, পুণ্যভূমি ইংল্যাণ্ডের সেবক। হেনলির মতো গৌণ কবি যখন লিখেছিলেন England, my England, England my own তখন তার প্রতিক্রিয়ার আবেদনের উৎসে আছে একটি অতিশয্যের তথ্য, যে তিনি বস্তুত ছিলেন স্কট এবং স্কটল্যাণ্ডের বেশ কিছু মানুষ আজকের মতো সেদিনও স্বপ্ন

দেখতেন স্বাধীন স্কটল্যাণ্ডের। কিন্তু ইয়েটসের আয়ার্ল্যাণ্ড ছিল অনেক তীব্র তীব্র বেদনায় বাস্তব। তাই জরায়নের মধ্যেও বৃদ্ধ কবি চেয়েছিলেন আইরিশ যুবকযুবতীদের আহ্বান জানাতে :

Cast your mind on other days

That we in coming days may be

Still the indomitable Irishry—তাই সারা ইংরেজভাষী সমাজের মহাকবি তিনি নিজের সমাধি-স্মারক লিপিতে বলেন :

Under bare Ben Bulben's head

In Drumcliff churchyard Yeats is laid.—এবং তাঁর গর্বিত শেষবয়সের একটি প্রিয় প্রতীক বা ভাবপ্রতিমা—ঘোড়সওয়ারকে বলেন :

Cast a cold eye

On life, on death.

Horseman, pass by (৪.৯.১৯৩৮)

অবশ্য তিনি ভালোই জেনেছিলেন বার্ধক্য কি অভিজ্ঞতা ; বস্তুত তিনিই বোধহয় বার্ধক্যের ও জরার শ্রেষ্ঠ কবি। লীভিস সাহেবকে জবাব দিয়ে ইয়েটসের পরিণত বার্ধক্যের কবিতাকে তাই এলিঅট তারিফ করেন তার প্রায় ভয়ানক শক্তিমত্তার জন্য।

Now that my ladder's gone

I must lie down where all the ladders start,

In the foul rag-and-bone shop of the heart.

এই মহাকবির কবিতা আদ্যন্ত আবার যদি পাঠ করা যায় ভ্যারিওরম্ কাব্যসংগ্রহে তাতে আবার ভালো করে বোঝা সহজ হয় তাঁর বিকাশের প্রকৃতি ও তাঁর মহত্ত্ব। ১৯২৫-এ হয়তো মনে হত তিনি এলিঅটের মতো স্মরণীয় নন, যুগের প্রতিনিধি নন বা আধুনিক কাব্যলক্ষণে সমান মণ্ডিত নন। খানিকটা ভুলই মনে হত, কারণ ১৯১০ নাগাদই দেখা যায় ইয়েটসের কাব্যলক্ষ্মী সাজবদল করছেন। এবং তাঁর একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই নয় তাঁর বিবাহ। আয়ার্ল্যাণ্ডের জীবনে মহাদুর্যোগ ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল ; এবং ইয়েটসের কবিকর্তৃত্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর আইরিশ সাহিত্যের আন্দোলনে এবং বিশেষ ক'রে নাট্য-আন্দোলনে ইয়েটস্ কর্মিষ্ঠভাবে যুক্ত হচ্ছিলেন। এবং কমবেশি রাজনীতিতেও, যে রাজনীতি কয়েকবছরে হয়ে উঠল বর্বর অত্যাচারে

জর্জর এবং প্রতিহিংসায় হিংস্র—যে অত্যাচারের একটি পর্বে—ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান্ পর্বে কর্তাব্যক্তি হয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের একজন দুর্দান্ত আমলা জন এণ্ডারসন—যিনি আমাদেরও সুপরিচিত জন এণ্ডারসন।

রোমান্টিক প্রতীকবিলাসী মন বোধহয় ভাবত যে ইয়েটসের public tone বক্তা বা প্রকাশ্য সভার কণ্ঠস্বর সৎকবিতার বিরোধী, কারণ কবিতার সৎ আবেদন কি শান্ত নতকণ্ঠ আবেদনেই সত্য নয়? ভাবত যে এলিঅটের পাশে এই কবির আলঙ্কারিক কণ্ঠস্বর কবিরই সজ্ঞানে চেষ্টা, যাতে কেন্দ্র শিথিল ও চ্যুত না হয়। তাই তাঁর যৌবনে দেখি বহুপ্রচলিত কেল্টিক গান কবি শোনেন গ্রাম্য কোনও বৃদ্ধার করুণকণ্ঠের টানা সুরে এবং তার ভাষা না জানলেও অভিভূত হয়ে লেখেন বস্তুতঃ ভিন্ন এক কবিতা: Down by the Salley Gardens. এই কবিতাটি ইয়েটসের নাটকীয় ফাঁপা অর্থাৎ শ্রুতিস্থূল তরঙ্গিত উচ্চস্বর কণ্ঠের আবৃত্তি রেকর্ডের সাহায্যে শোনার সুযোগ হয়তো কারো কারো হয়েছে। সেই পাঠের সঙ্গে ঐ মূলগানটি শ্রুতিনিপুণা ক্যথলীন ফেরিঅরের গাওয়া রেকর্ডের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু বোঝা যায় কিভাবে এই সুকুমার শৌখীন কবিত্ববাদী কবি নিজের হৃদয়বত্তার তাগিদে নিজের প্রতিভার ডিমনিক আধিদৈবিক তাড়নায় ক্রমশঃ অর্জন করতে লাগলেন সংবেদনশীল মনের কবিত্বেরই প্রচণ্ড ট্রাজিক ভাষা, যে মন শিঁটিয়ে থাকত from all business class of people, but not all classes.—একধরণে প্রায় রবীন্দ্রনাথেরই মতো। বোঝা যায় কি করে তিনি তাঁর মনের বালাই নিয়ে শৈশব থেকে আহত হয়েছেন ইংরেজের ভিক্টোরীয় আত্মপ্রসন্ন স্থূলতার দ্বারা, ভিক্টোরীয়দের ধর্মের স্থূল ব্যবহারিকতায় অধ্যাত্মকে মর্মহীন করে তোলায়, আহত হয়েছেন তখনকার পজিটিভিস্‌ম্, প্রয়োগবাদ, উপযোগবাদ ইত্যাদি সব ইন্দ্রিয়বিরোধী সুতরাং অতীন্দ্রিয়বিরোধী সাম্রাজ্য-সহায়ক ইংরেজী মনোজগতের চাপে।

তাই তাঁকে বারবার ফিরতে হয়েছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের পুরাণ, রূপকথা, লোকসাহিত্যসঙ্গীতের জগতে, গরিব বিচ্ছিন্ন জেলেচাষীদের দেশে। এবং তাঁর সেনেটবক্তৃতার সংগ্রহটি পড়ে অবাক লাগে তাঁর সর্ব বিষয়ে জাগ্রত মননে। তাদের জীবনের পরোক্ষ প্রভাব তাঁর কাব্যে ও মননে। এমন কি তাঁর অলৌকিকতার তত্ত্বসন্ধান, তাঁর মরমিয়াবাদও সংলগ্ন ছিল আদিম আইরিশ মানসিকতায়। চিশায়ার চীজ্ ও রাইমর্স ক্লব্ এই সংলগ্ন শক্তির পাশে ক্রমেই ম্লান হতে লাগল। ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ডের কাব্যের অগ্রদূতদের মধ্যে দেখা দিলেন

ইয়েটসের ভক্তবন্ধু এজরা পাউণ্ড তাঁর প্রবলতায়, এলেন আরেক নবাগত তরুণ, শান্তশিষ্ট বিনীত টমাস এলিঅট। তাঁরা সাক্ষাৎভাবে জানতেন ইওরোপীয় কাব্যের আধুনিক রূপ,—তখন এল স্পষ্টতার চর্চা এমন কি প্রতীকেরও স্পষ্টতা, মিতভাষিতা, যাথার্থ্যে মনোযোগ এবং মানুষের কথাবার্তায় যে প্রত্যক্ষ ছন্দ, যে বেগধর্ম, যে নির্দিষ্ট কিন্তু তীব্র প্রকাশক্ষমতা তারই সাধনা। দি গ্রীন হেলমেটের সময় থেকে ইয়েটস্ একদিকে যেমন ক্রমেই সমধিক আইরিশ তেমনি আবার উত্তরোত্তর সমধিকভাবে আধুনিক ইংরেজ অর্থাৎ ইওরোপীয় কবি।

The fascination of what's difficult
Has dried up the sap out of my veins and rent
Spontaneous joy and natural content
Out of my heart.

এবং তাঁর শেষ কবিতানিচয়ের পরে বোধ হয় তিনিই শ্রেষ্ঠ আধুনিক ইংরেজ কবি ব্যাপ্তিতে এবং তীব্রতায় সবচেয়ে বেশি বাস্তবনির্ভর ঐশ্বর্যে পূর্ণ কিন্তু আরেক বিবেচনায় রিক্ত শুদ্ধ বলিষ্ঠ কবিত্বে অস্থির। ইংরেজী কাব্যে টেনিসন ব্রাউনিঙের পরে বোধহয় তাঁরই নাম করতে হয়।

অবশ্য অমনোযোগী পাঠে মনে হতে পারে যে প্রাথমিক ইয়েটস্ ও পরিণত ইয়েটস্ দুই কবিধর্মের কবি। মনে হওয়াটা এক হিসাবে হয়তো সম্পূর্ণ ভুল নয়। কিন্তু ভেবে দেখলে, ইয়েটসের শতবার্ষিকীতে আবার মনে হয় যে তাঁর কাব্যে বৈচিত্র্য ও ঝোঁকের রকমফের থাকলেও তার মধ্যে একটিই, জটিল, ঈষৎনাটকীয় ব্যক্তিস্বরূপ। সেখানেই তাঁর চারিত্র্য। এই ক্রমাগত সংলগ্নতা অন্তত আমাকে মুগ্ধ করে। ধরুন তাঁর বিখ্যাত সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধযুগের কবিতা An Irish Airman forsees his Death এবং তুলনা করুন বোধ হয় সমসাময়িক কিন্তু তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে ১৯৪৮-এ প্রকাশিত Reprisals-এর সঙ্গে যার আরম্ভ হচ্ছে :

Some nineteen German planes, they say,
You had brought down before you died,
We called it a good death. To-day
Can ghost or man be satisfied ?

এবং যার শেষ :

Men that revere your father yet

Are shot on the open plain.
Where may newly-married women sit
And suckle children now ? Armed men
May murder them in passing by
Nor law nor parliament take heed.
Then close your ears with dust and lie
Among the other cheated dead.

ইয়েটসের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান প্রবল মানবিকতার একটি উৎস নিশ্চয়ই ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার লড়াইয়ের তিক্ত দুঃখকষ্ট, তাই বিশেষ কয়েকটি ভীষণ ঘটনা—ষোলোজন মৃত মানুষ, ডাকঘরে আক্রমণ, পথের মধ্যে নির্দোষ অজ্ঞ এক মাতাকে drunken soldiery-র হঠাৎ গুলি করে হত্যাকাণ্ড—এরা ঘুরে ফিরে আসে কবির স্মৃতিতে কবিতায় ঋজু পরিণতির পর্বে পর্বে।

এই পরিণতির একটি উদাহরণ আপনাদের কাছে উদ্ধৃত কার। আমাদের মোহিনী চাটুজ্জে মহাশয়কে তিনি ১৮৮৬-তেই গুরুস্থানীয় ভেবেছিলেন, ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বে তিনি খুঁজেছিলেন ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী স্থূলত্বের প্রতিবাদী প্রজ্ঞা এবং ১৮৮৮-তে Kanva on Himself কবিতাটি প্রকাশিত হয়—নামটি লক্ষ্য করবেন—The Vegetarian বা নিরামিষাশী নামক এক পত্রিকায়। কবিতাটির সুইনবর্নীয় tumorous অন্ত্যমিল-বিলাসের সঙ্গে ঐ একই ভাবনাচিন্তা নিয়ে পরের কবিতার তুলনা করুন :

Now wherefore hast thou tears innumerous ?
Hast thou not known all sorrow and delight
Wandering of yore in forests rumorous,
Beneath the flaming eyeballs of the night,

And as a slave been wakeful in the halls
Of Rajas and Maharajas beyond number ?
Hast not thou ruled among the gilded walls,
Hast thou not known a Raja's dreamless slumber ?

এবং এবম্বিধ আরো দুটি স্তবকের একটি শেকসপিঅরীয় অলঙ্কারপ্রয়োগে শেষ স্তবকটি :

Then wherefore fear the usury of Time
Or Death that cometh with the next life-key ?
Nay, rise and flatter her with golden rhyme,
For as things were, so shall things ever be.

"মোহিনী চাটুজ্জে" কবিতাটি প্রথম বেরোয় ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে London Mercury-তে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে New Republic-এ, ১৯৩১ সালের ১৪ই জানুআরি সংখ্যায়; মৃত্যুর উপর ধ্যান-ধারণা নামে একটি বড় কবিতার অংশরূপে। মোহিনীবাবুর তখন দৃষ্টিশক্তি নেই, মনে আছে কবিতাটি শুনে তিনি কিরকম স্মিতমুখে বলেছিলেন, দেখ, ইয়েটস এতদিন পরে আমার নামে আবার একটি কবিতা লিখল :

I asked if I should pray,
But the Brahmin said,
Pray for nothing, say,
Every night in bed,
"I have been a king
I have been a slave,
Nor is there anything,
Fool, rascal, knave,
That I have not been
And yet upon my breast
A myriad heads have lain."

কেবলমাত্র ধ্বনির বিচারেও কবির বিবর্তন নমস্যপরিণতি।

প্রার্থনা করব আমি কিনা,
আমার এ প্রশ্নের উত্তরে
ব্রাহ্মণ বললেন আমায়
'কোরোনা কিছুই প্রার্থনা,
বোলো প্রতি রাত্রে বিছানায়
"আমি তো ছিলাম মহারাজ
আমিই ছিলাম ক্রীতদাস,
ছুনিয়ায় কিছু নেই আজ

মূর্খ, জুয়াচোর বা বদমাশ
আমি যা হইনি একবার
অথচ আমার বক্ষ'পরে
লক্ষ মাথা রেখেছে তো ভার।"

বালকের চণ্ড দিনরাত
যাতে হয় প্রশান্ত অন্যথা,
মোহিনী চ্যাটার্জী বললেন,
ঐ বা অমনিতর কথা।
আমি জুড়ি টীকার ব্যাখ্যান,
'বৃদ্ধ প্রেমিকেও পেতে পারে—
দেয়নি যা আজও মহাকাল,
মিটবে তাদের সাধ, তাই
কবরে কবর গাদা করে,
দুনিয়ার আভার জমিনে
চিরস্থায়ী ফৌজের কাওয়াজ,
জন্মের গাদায় জন্ম জমে,
যাতে ঐ কামান দাগার
আওয়াজেই ত্রিকাল পালান,
জন্ম-মৃত্যু-লগ্ন মিশে যায়
অথবা ঋষিরা যা বলেন :
মানুষের নৃত্য নিত্য মৃত্যুহীন পায়ে॥'

ইয়েটসের আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতিমায় ভারতীয় চিন্তা যে কত অন্তরঙ্গভাবে মিশ্রিত, তাঁর বহু কবিতায় তা স্পষ্ট, যেমন স্পষ্ট গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায়। পুরোহিতস্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের যুগে ইয়েটসের উপনিষদ অনুবাদে, পুরোহিত-স্বামীর বই-এর সম্পাদনায় নানাভাবে এই কথাই প্রমাণিত। সেইসময়ে, ১৯৩৫ নাগাদ তিনি তাঁর "অতিপ্রাকৃত গীতিমালা"র টীকায় লিখেছিলেন— এখন আমি প্রাচীন খৃস্টিআন আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়তা দেখতে পাই। এবং পুরোহিতস্বামীর এক হিমালয়স্থিত অভিজ্ঞতার কাহিনীতে তিনি প্রাচীন আইরিশ পুরাণের এক সন্তের—সেলাক্-এর কথা ভাবেন, আর

ভগবান শ্রীহংসের কৈলাস বা মেরু-তীর্থ ও মানস-সরোবর যাত্রায় পান সেকালের আইরিশ তীর্থযাত্রার মিল।

স্থতরাং এই মিল রাজনীতির তুল্যতাতেও জন বুলের অপর-দ্বীপের মানুষ হয়ে সেনেটর ইয়েটসের পক্ষে পাওয়া খুবই সঙ্গত :

O what has made the sudden noise ?
What on the threshold stands ?
It never crossed the sea because
John Bull and the sea are friends ;…

… … … …

John Bull has stood for Parliament,
A dog must have his day,
The country thinks no end of him,
For he knows how to say,
At a beanfeast or a banquet,
That all must have their trust
Upon the British Empire,
Upon the Church of Christ.
The ghost of Roger Casement
Is beating at the door.

John Bull has gone to India
And all must pay him heed,
For histories are there to prove
That none of another breed
Has had a like inheritance
Or sucked such milk as he,
And there's no luck about a house
If it lack honesty.
The ghost of Roger Casement
Is beating at the door. ইত্যাদি

বলাই বাহুল্য. ইয়েটসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্তর প্রতিভার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও কর্মময়তার কোনও তুলনা হয় না এবং কবিস্বভাবের বা তত্ত্বের দিক থেকেও তাঁদের বিকাশ সহজ কারণেই ভিন্নধর্মী। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বে নিশ্চয়ই বলা সম্ভব হত না—

Those men that in their writings are most wise
Own nothing but their blind, stupefied hearts.

পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েটস উত্তরোত্তর প্রবৃত্তিপ্রধান জীবনের উপর বেশি ঝোঁক দিতেন। তাই আটত্রিশ সালেও তিনি বলেন :

You think it horrible that lust and rage
Should dance attention upon my old age ?
They were not such a plague when I was young ;
What else have I to spur me into song ?

—আত্মপ্রত্যয়ের অভাব এ কবির কোনও কালেই ছিল না, পণ্ডিতদের বিষয়ে তাঁর অবজ্ঞা তো কবিতাতেই প্রকাশ আর নিজের দুরূহ ও একাগ্র কাব্যসাধনার সাংসারিক মূল্য বিষয়ে তাঁর গর্বিত পরিগ্রহণ :

all my priceless things
Are but a post the passing dogs defile.

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ মেজাজ বিরুদ্ধ হত এবং কাব্যে আধুনিকতার এ তত্ত্ব তাঁর পক্ষে অবান্তরই ছিল : before verse can be human again it must learn to be brutal. রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই পূর্ণপরিণত ইয়েটসের কবিতাকে এলিঅট পাউণ্ডদের মতোই অঘোরপন্থী বলতেন।

কিন্তু ১৯১৩-র ভক্তি-উচ্ছ্বাসের পরেই কেন ইয়েটস্ বলতে লাগলেন, ড্যাম্ টেগোর ! এবং যে পাউণ্ড বিহ্বল চিঠি লিখেছিলেন তাঁর মাতাপিতাকে এবং হ্যারিয়েট মনরোকে ১৯১২-তেই, তিনিই বা কেন সুর বদলালেন—ব্যথিত প্রশ্নে সে কথা আমিও অনেক ভেবেছি। ইংরেজিতে বিচিত্রতম কবি রবীন্দ্রনাথেরও কবিত্বের একই রূপে রূপায়িত চেহারাই বোধ হয় দায়ী।

(৩)

অবশ্য পাউণ্ডের রূঢ় রসিকভাষাই ঐ রকম, এলিঅটের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ঐ রকম নকল গুণ্ডামিতে বিদগ্ধ ; এবং আপনারা জানেন পাউণ্ডের সমালোচনা

ও কলমের কাঁচিতে আদি Wast. Land হয়ে যায় আকারে অর্ধেক, যে আকারে কবিতাটি আমাদের পরিচিত। সেই সন্মার্জনের পাণ্ডুলিপিটি হারিয়ে যায় জেমস্ কুইনের সংগ্রহ থেকে এবং কৃতজ্ঞ বন্ধু হলেও এলিঅট তাতে বলেন: On the other hand, for my own reputation, and for that of the *Waste Land* itself, I am rather glad that it has disappeared.

ইয়েটস্ যখন ১৯৩৪ নাগাদ 'A prayer for my old Age' লিখছিলেন—

> I pray—for fashion's word is out
> And prayer comes round again—
> That I may seem, though I die old,
> A foolish, passionate man.

সেই সময় তিনি পরামর্শ চান উৎকেন্দ্রিক কিন্তু কনিষ্ঠ তরুণ কাব্যপ্রাজ্ঞ বন্ধুর। একটি ভূমিকায় ব্যাপারটার একটা মুখরোচক বর্ণনা আছে। পাউণ্ড নিজের কাব্যশক্তি বিষয়ে উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ কবিকে পরের দিন মতামত জানান, একটি কথায়: Putrid,—একদম পচা। পাউণ্ড ভুল করেছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই রকমই বোধ হয় মেজাজ ইয়েটসের egotistical sublime মনীষার,—যার নমুনা পাই লেডি ওয়েলেসলিকে লণ্ডনে আসার হুকুমে বা রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের জন্ম-উৎসবের স্বর্ণপুস্তকে ছাপা তাঁর আশ্চর্য চিঠিতে এবং ঐ মেজাজ পাউণ্ডের ইয়াঙ্কি বিশ্ববৈদগ্ধ্যেরও।

রবীন্দ্রনাথ খুশিতে হেসে বলেছিলেন: এজ্‌রা পাউণ্ড, সে আমার ভারি ভক্ত ছিল, একেবারে পাগল, প্রায়ই আসত, সোফায় বসত না, পায়ের কাছে বসত, লিখেও ছিল আমার বিষয়ে।

কল্পনা করা যায়, লণ্ডনের বাসায় একান্ন বছরের প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে মাঝপশ্চিমা আমেরিকান উদ্দাম কবি ছাব্বিশ বছরের এজ্‌রা। সরোজিনী নাইডুর গল্প মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদে নিজাম-প্রাসাদে সন্ধ্যা ছটায় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে ফরাসী-শিক্ষিত তুর্কী সুলতানকন্যা নিজামের পুত্রবধূ কবির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থেকে থেকে বলছেন, ইউ আর বিউতিফুল। কয়েকবার একথা শোনার পর পশ্চিম-গামী সূর্যের দিকে ধ্যানমগ্ন কবি মুখ নামিয়ে বললেন, ইউ টু আর বিউটিফুল!

এজ্‌রা পাউণ্ড অবশ্য তাঁর প্রথম উচ্ছ্বাস অচিরেই কাটিয়ে ওঠেন, যেমন

ওঠেন উইলিঅম বট্‌লর ইয়েটস্‌। কারণ প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনায় ক্রমেই ভাবের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক পড়ছিল; বাংলায় তাঁর যে অসামান্য কবিপ্রতিভা বিচিত্ররূপে নানা কবিতায় কাব্যশরীর পায়, ই কাব্যশরীর এইসব ইংরেজি ভাবানুবাদে বড়োই অশরীরী হয়ে ওঠে। ইংরেজ পাঠকরা তাই অল্পকালের মধ্যেই পুনর্বিচার করতে আরম্ভ করেন। পাউণ্ডের ১৯১২-এর ভক্তি শীঘ্রই ঔদাসীন্যে দাঁড়ায়। তবু বলতে হবে ইয়েটসের ঘোর অবজ্ঞার রেশ বোধ হয় পাউণ্ডে পাওয়া যায় না। ১৯১২ সালে পাউণ্ড হ্যারিয়েট মনরোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান, লেখেন—ভেরি গ্রেট বেঙ্গলি পোএট, রবীন্দ্রনাথ টাগোর, অনুবাদকে বলে ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ প্রোস, উইথ মাস্টারি অফ কেডেন্স।

১৯১৩ সালের জানুআরিতেই পাউণ্ড চক্ষুষ্মান বা সাবালক হয়ে উঠেছেন। তখন রাজা পঞ্চম জর্জের জন্য রবীন্দ্রনাথ কি রকম ভাবে গান লেখেন, ভারতীয় ছাত্র কর্তৃক রচিত তার কাহিনী পাউণ্ড মহাকৌতুকে স্বীয় পিতৃদেবকে লিখছেন। এপ্রিল মাসের চিঠিতে পাউণ্ড কয়েকটি কথা লেখেন, যার সমালোচনা-মূল্য অনেক বিস্তৃত প্রবন্ধের চেয়ে বেশি। কিছুকাল আগে এমন একটি প্রবন্ধ পড়বার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাতে পণ্ডিতপ্রবর শিবনারায়ণ রায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিচার চেষ্টায় যে অন্যায় করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। শুধু আমাদের অনেক সময়ে অসতর্কতার বশে কি রকম ভুল হয়, তার একটি উদাহরণ দিই। শিবনারায়ণবাবু ভুলে গেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জর্মান সুরকারদের তুলনাই হয় না, কারণ তাঁরা কেউই রবীন্দ্রনাথের মতো কথা ও সুরে অর্ধনারীশ্বর গীতির রচয়িতা নন। পাউণ্ডের এই সমালোচনাটুকু তাঁর স্বকীয়তার জন্য মূল ইংরেজিতেই উদ্ধৃত করি :

God knows I didn't ask for the job of correcting Tagore. He asked me to. Also it will be very difficult for his defenders in London if he takes to printing anything except his best work. As a religious teacher he is superfluous. We've got Lao Tse, And his (Tagore's) philosophy hasn't much in it for a man who has 'felt the pangs' or been pestered with western civilisation. I don't mean quite that. but he isn't either Villon or Leopardi, and the modern demands just

a dash of their insight. So long as he sticks to poetry he can be defended on stylistic grounds against those who disagree with his content. And there's no use his repeating the Vedas and other stuff that has been translated. In his original Bengali he has the novelty of rime and rhythm and of expression, but in a prose translation it is just 'mere theosophy', small of course if he wants to set a lower level than that which I am trying to set in my translations from Kabir, I can't help it. It's his own affair.

১৯১৭ সালে পাউণ্ড লেখেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার রহ বিষয়ে একটি মজার চিঠি। এলেক এরেনসনের "পশ্চিমার চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" বই যাঁদের পড়া তাঁরা অবশ্য এই রহস্যের কাহিনী জানেন।

Tagore got the Nobel Prize because, after the cleverest boom of our day, after the fiat of the omnipotent literati of distinction, he lapsed into religion and optimism and was boomed by the pious non-conformists. Also because it got the Swedish Academy out of the difficulty of deciding between European writers whose claims appeared to conflict (Sic) Hardy or Henry James.

Tagore obviously was unique in the known modern Orient. And then, the right people suggested him. And Sweden is Sweden. It was also a damn good smack for the British Academic Committee, who had turned down Tagore (on account of his biscuit complexion) and who elected in his stead to their august corps, Alice Meynell and Dean Inge.

Therefore his Nobel Prize gave pleasure unto the elect.

পরের এক চিঠিতে পাউণ্ডের উদ্গার পাওয়া যায় ভারতবর্ষ বিষয়ে, তার শেষে আসে এই বাক্যটি Rabi himself···hopeless re : statal sense etc.

হয়তো বা ভক্তির জালে পড়লে পরে মানুষ এইভাবে নিজেকে বার করবার

চেষ্টা করে ; ভাবে, না হলে সে "লায়েক" বা সাবালক হতে পারছে না। কিন্তু ১৯১২-র শেষে পাউণ্ডের প্রবন্ধটি তৎসত্ত্বেও বিস্ময়কর লাগে, তাঁর চোখ-কানের প্রখরতার প্রমাণ হিসাবে। তাছাড়া পাউণ্ড বা ইয়েটসের মতো তীক্ষ্ণধী কবি-সমালোচকদের কথা আমাদের অনেক কিছু বিষয়ে ভাবাতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজি চেহারায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তির অসম্পূর্ণতা, তাঁর কবিত্ব-শক্তির প্রবলতা এবং তাঁর চারিত্র্য এই অনুবাদে প্রায় চাপা প'ড়ে আছে, আধ্যাত্মিক আবেদনের বিষয়ে একটা সামগ্রিক ধারণার জের ইংরেজিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশকে ব্যাহত করে। কর্তৃপক্ষের উচিত রবীন্দ্র-রচনার নূতন মানের অনুবাদের ব্যবস্থা করা। কিন্তু শেষ অবধি ভারতদ্বেষীকেও মানতে হবে যে, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে পাউণ্ড যে তিনটি ছোট বড় প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলি শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে এবং কাব্যজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিতে অসামান্য। তিনটি প্রবন্ধই সাহিত্যপত্রে অনূদিত হয়েছে। তার দ্বিতীয়টি থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত ক'রে আজকের পাঠ শেষ করি। পাউণ্ডের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' বিষয়ে আশ্চর্য গভীর প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতাবলীর প্রকাশ আমার মতে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। জানি না, পাঠকদের একথা বোঝাতে পারব কি না। আমার কথার প্রমাণ অবশ্য কবিতাগুলিই। এ কবিতা পড়তে হবে আস্তে আস্তে, নিস্তব্ধ শান্তিতে চেঁচিয়ে। কারণ এর ইংরেজি অনুবাদ লিখেছেন একজন বিরাট সঙ্গীতকার, একজন ওস্তাদ শিল্পী যাঁর কারবার আমাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার সঙ্গীত নিয়ে।

এক মাস হয়ে গেল, শ্রীযুক্ত ইএট্‌সের ঘরে গিয়ে দেখলুম তাঁকে মহা উত্তেজিত এক মহাকবির আবির্ভাবে, আমাদের সকলের চেয়ে মহত্তর এক কবি।

কোথায় আরম্ভ করব ভাবছি। বাংলাদেশে পাচ কোটি লোক। বাইরে থেকে মনে হয় রেলগাড়িতে আর গ্রামোফোনে এ জাতটা বুঝি ডুবেছে। কিন্তু এর তলায় তলায় আছে একটা সংস্কৃতি, যার সঙ্গে তুলনীয় বিংশ শতাব্দীর প্রভঁস্।

ঠাকুরমশায় এদের মহাকবি আর মহাসঙ্গীতকারও বটে। ইনি এদের জাতীয় সঙ্গীত দিয়েছেন, মার্সেএস্-এর সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্যশোভন গান। তাঁর সোনার বাংলা আমি শুনেছি। তার সুর সম্পূর্ণ প্রাচ্য, কিন্তু অদ্ভুত তার জাদু,

ভিড়কে মাতাবার মতো। এ গানটা জাতে সীমাবদ্ধ, ঠুংরী জাতের, ব্যক্তিগত কিন্তু কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ।

প্রসঙ্গত ও কথাটা বললুম। এতে এই প্রমাণ হয় যে, দান্তে-কথিত তিনটি মহাকাব্যের বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে: প্রেম, জাতীয়তা বা যুদ্ধ, আর আত্মিক মাহাত্ম্য।

মধ্যযুগের আর একটা গুণও লক্ষ্য করা যায় এখানে। ঠাকুরমশায় বহু লোককে তাঁর গান শেখান, তারা জঁগলোরের মতো বাংলাময় সেই গান ছড়িয়ে বেড়ায়। ত্রুবাদুরদের মতো তিনিও গর্ব করতে পারেন, এ সব আমার রচনা কথায় ও সুরে।

এ কবিতার বাংলা কাব্যরূপ খানিকটা প্রভঁসাল কানৎসোনি আর প্লেই-আড্‌দের গাথা, রাউণ্ডেল ইত্যাদির মাঝামাঝি। মিলের ব্যবহার অন্য রকম, বাংলাতে চার অক্ষর বা স্বরবৃত্তের মিল পাওয়া যায়, যা লিওনিন বা মধ্যযুগের অন্তমধ্যমিলান্ত ষটমাত্রিক শ্লোকের চেয়েও সূক্ষ্ম ও কঠিন।

বাংলা ছন্দবৃত্ত পশ্চিমের মধ্যে মুক্ত-ছন্দের সবচেয়ে আধুনিক বিকাশের সঙ্গেই তুলনীয়। ভাষাটাও সংস্কৃতজ। এর আওয়াজ আমার কানে শুদ্ধ গ্রীক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি লাগে।

বাংলাভাষা বিভক্তিমূলক, তাই এতে মিল সহজ। গ্রীক বা জর্মানের মতো বাংলাতে সমাস বা সন্ধি চলে। ঠাকুরমশায় বললেন, তিনি এর ব্যবহার প্রায় সব কবিতাতেই করেন।

এসব দিয়ে দেখাতে চাই যে, বাংলাভাষা কবিতার সহায়, এর তারল্য এবং ব্যাকরণের নমনীয়তায় শব্দে সার্থক তীক্ষ্ণতা আনা যায়। এ ভাষায় কথার পারম্পর্য এদিক-ওদিক করা যায়, ইংরেজির মতো অর্থের গোলমাল না ক'রে।

ঠিক মানেটা, ধারালো সার্থকতা এতে সহজ, কারণ প্রত্যেক বস্তরই প্রায় স্বতন্ত্র নামশব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণত ইংরেজিতে আমরা বলি স্কার্ফ, ঠাকুরমশায়ের গান শোনাতে শোনাতে অনুবাদে কথাটা এসেছিল, কিন্তু বাংলায় স্কার্ফ এক বস্তু নয়, যথা অঞ্চল ও উত্তরীয় বা কোঁচার খুঁট।

এ বই-এর শ'খানেক কবিতা সবই প্রায় গান। সুর আর কথা এখানে অঙ্গাঙ্গী এবং প্রাচ্যের সঙ্গীত এ বিষয়ে বিশেষ শোভন মনে হয়। প্রথমত এখানে হারমনির হাঙ্গাম নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রীক মোড্‌স্-এর মতো রাগ-রাগিণীর

ব্যাপারটাও সাহায্য করে। কারণ এই রাগিণীতে ভাবানুষঙ্গ জাগে, ফলে বাঙালী শ্রোতা প্রথম চরণ শুনেই কবিতার স্থানকালপাত্র বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

রাগ-রাগিণীর এই সঙ্গতি আমার তো মনে হয় ভারী কার্যকরী। অন্তত এতে কবিতা বা গানে একটা ধর্মাচারমূলক প্রথাসিদ্ধ শক্তি আসে এবং একটা বিশেষ কবিতা বা গান একটা স্বয়ম্ভু খাপছাড়া ব্যাপারও থাকে না, গানের ও জীবনের একটি সর্বগ্রাহী সম্পূর্ণতার অংশমাত্র হয়। তাই এ গানে মানুষ ব্যক্তিত্বের গণ্ডি থেকে সহজে মুক্তি পেয়ে কালস্রোতে, বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণতায়, যথাযথ বিধিবদ্ধ শান্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

লেখকমশায় বলেন জানি না এতে আরো কিছু আছে কিনা, আমাদের কাছে এর মূল্য সমধিক, কিন্তু সে হয়ত অনুষঙ্গে। আগের সন্ধ্যায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই অনুবাদে কি পাও? ইওরোপীয়কে টানবে ব'লে কখনো ভাবেনি।

আশ্চর্যই বা কি যে ঠাকুরমশায় বিদেশী ভাষায় গদ্যে তাঁর কবিতায় কি থাকে তাই ভাবেন, মূলের আঙ্গিক সৌন্দর্য, সুর, ছন্দ, মিলের সূক্ষ্ম মিশ্রণ এ সবই তো অনুবাদে বাদ পড়েছে।

আমি বোধ হয় তাঁর দিক থেকে সময় নষ্ট করেছি, কারণ আমি তাঁর কবি-মানস ও বক্তব্য ছেড়ে তাঁর শিল্প ও প্রকাশভঙ্গি নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলুম।

তাঁর ভাষার যাথার্থ্য রইল। শুধু চোখে পড়লে তাঁর ইংরেজি গদ্যের গতি এড়িয়ে যাবে। চেঁচিয়ে, একটু দ্বিধান্বিত চালে পড়লেই কিন্তু ছন্দের সুষমা ও সৌকুমার্য স্পষ্ট হয়। এই ছন্দসৌভাগ্য আমার বিশ্বাস চৈতন্যের গভীরে ঘটেছে, আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল শব্দ-স্বরায়ণের পরে কোনো লোক এরকম গদ্যছন্দ ব্যবহার করতে পারেন। নিজের অজ্ঞাতসারেও তিনি শব্দের বেসুরো যোজনা করতে পারেন না।

তারপর যেটা সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে মধ্যে মধ্যে জলজলে কথা পাওয়া যায়,—কখনো বা তাতে হেলেনিক শুদ্ধি, কখনো বা দ'গুরমো। বা বদলেয়রের চরম নাগরিক চাল।

কিন্তু এর ভিতরে আর একে ঘিরে আছে একটা শান্ত স্থিরতা। হঠাৎ আমরা খুঁজে পেলুম আমাদের নূতন গ্রীস। রেনেসানস্-এর সময়ে ইওরোপে

যেমন সামঞ্জস্যবোধ ফিরে এল, তেমনি আমার মনে হয় যে আজকের এই যন্ত্রের বিষম ঝঞ্ঝায় আমাদের মধ্যে এল এই একটা সুস্থ ধীরতা।

অডিসির নীতি—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন, মধ্যযুগের বিড়ম্বিত চিন্তাধারাকে এর চেয়ে বেশি মুক্ত করতে পারেনি।

এসব কথা হঠাৎ বলছিনে, আবেগের মাথায় বা একটা বড়ো কথার ঝোঁকে। এ বিষয়ে মাসাধিক কাল ভেবেছি।

এখনো ঠাকুরমশায়ের অননূদিত অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে বলবার সময় আসেনি। যে বইটি সামনে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় আমার জানা একটি বইই শুধু মনে পড়ছে, দান্তের পারাডিসো।

Ecco chi crescera linostri amori (ঐ দেখ ! আমাদের প্রেমগুলি যিনি বিকশিত করেন) দান্তে চতুর্থ (?) স্বর্গে ঢুকে সহস্র আত্মার এই গান শোনেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কণ্ঠ অন্যরকম, তার অতীন্দ্রিয় ভক্তি ততটা আবেগময় নয়, বরং শান্ত। এরকম কথা—Poiche fur gioconde della faccia di dio (যেহেতু ঈশ্বরের মুখশ্রীতে এদের আনন্দ) প্রাচ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেবে বলেই মনে হয়।

বোধ হয় স্বর্গের মৌমাছিরা গোলাপের মধ্যেই অন্তস্ফুট, এই দিব্যচিত্রই রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের চাবি।

তাঁর মধ্যে প্রকৃতির স্তব্ধতা সমাহিত। কবিতাগুলি মানসিক জলঝড় বা আগুনে তৈরি নয় ব'লে লাগে, মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক মনের ধারণাটাই এই রকম। প্রকৃতিতে তিনি মিল পেয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে কোনো বৈষম্য বা বিরোধ নেই। প্রতীচ্য রীতির সঙ্গে এইখানে তাঁর দারুণ তফাৎ, "মহৎ নাটক" আমরা লিখতে পারি মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিষয়েই। হেলেনিক ধারণা যে, মানুষ দেবতাদের হাতের পুতুল মাত্র, এবং কি দেবতা কি মানুষ উভয়েই ভাগ্যের ক্রীতদাস, এ ধারণা এই প্রাচ্য কবিতার বিপরীত।

ছ'মাস আগে আমি রেনেসান্সের মানবধর্ম প্রসঙ্গে লিখেছিলুম মানুষ মানুষ নিয়েই জড়িত, ভুলে যায় সমগ্রকে, দেশকালসন্ততিকে। ফলে পাই প্রথমে নাট্যের যুগ, তারপরে গদ্যের।

এ জাতের মানবধর্ম আজ স্রোত হারিয়ে শুকনো, মনে হয় বাংলা থেকে বুঝি তার সংশোধন ও সুসমীকরণ এল।

প্রমাণ করতে পারব না। মহৎ সৃষ্টির সমালোচনা প্রমাণ করার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিতেই সার্থক।

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে ॥

একশোটার একটা গান এটি, ইংরাজিতে এর রঁদেল রূপও নেই, উন্মনা, সুকুমার সুরও নেই। ছন্দোবৃত্তের কথাটা ভাবো, প্রথম শব্দে গলার তীব্রতা, তারপরে তিন চারটি স্বরে তারই রেশ টানা, ট্রকেইকের চেয়ে দীর্ঘ ছন্দোবৃত্তে।

উদ্ধৃতির জন্যে যে কবিতাই তুলি, পরেরটা পড়ে ভাবি বুঝি ভুল করলুম হয়তো সরল স্বীকারোক্তি সবচেয়ে ভালো সমালোচনা। ঠাকুরমশায়ের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনা মেশাতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে দুই-এর সম্পর্ক এত নিকট যে, আমি দুটো কথা বলব কিছু ব্যাখ্যা না করেই সোজাসুজি।

ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে যখন আসি, তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর, পরনে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র—মোটা ভারি কাঁটাওয়ালা অস্ত্র।

একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে হয়তো কি রকম স্বস্তি তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ঠাকুরমশায় সোফায় বসে, বাংলা থেকে পড়ে আমায় শোনাচ্ছেন, এমন সময় বাড়ির কর্ত্রীর তিন বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে ভীষণ হাসতে আর গোলমাল করতে লাগল। কবি তক্ষুণি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, ঠিক শিশুটির সুরেই।

তিনি কি হঠাৎ শিশুর উল্লাসে তার সঙ্গে এক হ'য়ে গেলেন? না এ কি প্রাচ্য ভদ্রতা? অথবা এটা কি সোজাসুজি স্বীকার যে বিশ্বের সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা আর শিশুর স্ফূর্তি একই ছকে পড়ে?

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

এ কবিতাগুলিকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভাবলে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা বদলে যাবে। কারণ এতে সেই তথাকথিত নেতিবাদ তো নেই, আছে গ্রহণের আলোক।...

সংক্ষেপে এ কবিতাগুলিতে আমি পাই একটা চরম শুভবুদ্ধি, যাতে করে আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের বিশৃঙ্খলায়, শহরের গোলমালে, কলে-তৈরি

সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনের ঘূর্ণিতে যে সব জিনিস চাপা পড়ে যায়, তাই আবার চোখে পড়ে।

যদি কোন দোষ থাকে, তাহলে কবিতাগুলির সাধুভাবই হয়তো জন-সাধারণের পক্ষে দোষ বলে গণ্য হবে। আমি অবশ্য তা মানি নে। আমার তো করুণাই জাগে যখন দেখি কোনো পাঠক বোঝে না যে, এ সাধুতা বা ভক্তি দান্তের মতো কবিত্বজ ভক্তি এবং সুন্দর।

সোনালী রূপালী সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে বুনিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।
যেদিন ফুটল কমল কিছু জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

এই প্রশান্তিই দেখি মৃত্যুর কবিতাগুলিতে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী।
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।

সুইনবর্নের কবিতার আবহাওয়া অবশ্য ঠাকুরের কবিতা থেকে একেবারে আলাদা—ঠাকুরমশায় সত্যই বলতে পারেন—

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখেনি আর সাজের অহঙ্কার।

নিছক স্বার্থে আমি গীতাঞ্জলির সমাদর চাই। ঠাকুরমশায়ের এছাড়াও অনেক রচনা আছে, নাটক, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। শিশুর কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, কবে বেরোবে আগ্রহে ভাবছি।

সমালোচনায় যখন কূল পাওয়া যায় না, তখন সমালোচ্য রচনার মূল্য সম্বন্ধে নিজেকেই ব্যক্তিগতভাবে জমা রাখতে হয়

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই॥

একথা ঠাকুরমশায় নিজের লেখার বিষয়ে খুবই বলতে পারেন, সব মহৎ শিল্পেই দূরের লোক বন্ধুতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরস্পরের শ্রদ্ধা এতে বাড়ে, অর্থবিজ্ঞানের শান্তি-প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতা দিয়ে স্বদেশসেবার চরম করলেন। তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিভাগের শ্রেষ্ঠ দূত।

তাঁর কবিতার সৌন্দর্য স্পষ্টতই প্রাচ্যের, কিন্তু সংহত কঠিন। অধিকাংশ দক্ষিণ প্রাচ্যের শিল্পের অতিপ্রাচুর্য এতে নেই, আমাদের মন এতে ব্যাহত হয় না। সর্বোপরি, তাঁর রচনা শান্ত ধীর রৌদ্রদীপ্ত বসন্তময়।... একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে আমার কাজ শেষ, এর পরে বলব বইটি পড়তে।

গোধূলিতে নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া রচনা। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সম্ভব হয়েছিল

সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

বয়স হলে ব্যক্তির মনে হতে পারে যে, তার সত্তা বংশপরম্পরায় হারিয়ে যাচ্ছে, এমন কি সে একরকম হেরেও গেছে। হয়তো বিগত যুগের সত্তাই তার চৈতন্যে প্রবল, সেই জীবন, সমাজ, আত্মীয়বন্ধুতেই কিঞ্চিৎ বেশি তৃপ্ত তার ভাবনাচিন্তা : আর সে ভাবনা

তার অন্তহীন, পদ্মার স্রোতের মতো
চরে চরে, কিংবা দূর শিখরের ঢলে
সচল অথচ স্থির ; দেখি অবিরত
চেনা মুখ, আধ-চেনা শরীর বা মনও,
শরীর ও মন, সচেতন নিঃসঙ্গের ঘরে
অদৃশ্য গলায় বলে : যাব না, যাব না।

অথচ সে-দেশ নেই, এই কালান্তরে
কলকাতা অচেনা, অপহৃত, অপসৃত,
সে পৃথিবী চ'লে গেছে, রয়েছি আধৃত
আমরা কয়েকজনা শুভ্র শূন্য চরে,
দুপাশে ফেনিল ঢেউ, রৌদ্রাক্ত আদরে।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি শিল্পী ও সাহিত্যিক হন এবং জীবন্ত হন তাহ'লে তো তাঁকে টানাপোড়েনের মধ্যেও সম-সাময়িক বাধ্যতই থাকতে হয়। এবং সাহিত্যিকের চোখে সমসাময়িক সমাজ সবসময়েই বোধহয় জিজ্ঞাসায় পরিগ্রহণে উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্তিতে বিদ্রোহে কমবেশি চাঞ্চল্যকর, অথচ সাহিত্যিক তো এই মিশ্র সমাজেরই ভবিষ্যতোন্মুখ অথবা অতীত-নির্ভর সরব সরিক।

অবশ্য সামাজিক গতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ জীবনযাত্রার বিন্যাসে ও মানসে জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীসাহিত্যিকের পক্ষে তার সমসাময়িক সমাজ যেমন উত্তেজনার মাত্রায় তেমনি নিত্যপরিবর্তনশীল জটিলতায় বিভ্রান্তিকর না হোক উদ্‌ভ্রান্তিকর বটে। কিন্তু বৃহৎ বিবেচনায় এ ব্যাপারটা ঘটছে আমাদের

জীবদ্দশার বেশ আগে থেকেই, কয়েক. শতাব্দী ধরেই। সম্প্রতি অর্থাৎ বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে এই জটিলতা আর তার দ্রুত পরিবর্তনীয়তার মাত্রা কমবেশি সব দেশেই বিশেষত দুর্গত ও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দেশে আমাদের স্বদেশে চৈতন্যকে প্রায় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড স্নায়ু বিকারে তোলপাড় করছে। মানবিক সভ্যতা ভব্যতার ধ্যানধারণা আদর্শ নিশ্চয়ই মানবিকভাবে অন্বিষ্টে জীবিত আছে, কিন্তু জীবনযাত্রার ভেদাভেদদীর্ণ স্তরে স্তরে, বাস্তব দৈনিকতার প্রত্যক্ষে তার চেহারায় নিশ্চয়ই রকমফের হয়েছে ও হচ্ছে, এমন কি তা হরেক ছদ্মবেশেও হচ্ছে।

বর্তমানকালে হয়তো এই পরিবর্তনশীলতা ও তার উজ্জ্বল বেগের মাত্রার ও ধোঁয়ার ভয়ঙ্করতা বয়স্কদের, বিশেষত আমাদের সাবেক বাঙালী বাবুসমাজে খানিকটা ঠিক-বেঠিকভাবে বিচলিত করে, নওলযৌবনের চালচলনে বিমূঢ় করে—যদিচ আশা করি বিমূঢ় বিরক্তি লাগে অপারগ ঈর্ষাবশত নয়, মূল্যায়নের কারণবশতই। তবে নবযুবকেরা যদি জুল্‌পি নেড়ে বলেন, ফুর্তি করার সাধ তো পিতামহদের কালেও ছিল, আলালের ঘরের দুলাল কি শুধু আমরাই, সধবার একাদশীটা না হয় একালে অচল কিন্তু মূল ব্যাপারটা কি ইঙ্গবঙ্গীয় রেনেসাসের তথা ইয়াঙ্কি-বঙ্গীয় রিফর্মেশনের সান্নিপাতিক নাড়িতেই স্পন্দিত নয়? তখন ভারিক্কি জবাব দেওয়া হয়তো দশ বিশ ত্রিশ দশকে জন্মওয়ালা বা লেখাপড়া-শেখাদের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়। রোয়াকে বা মোড়ে মোড়ে চোতাদার আড্ডা হয়তো ঠিক এ রূপ পায় নি, কিন্তু তেমনি পারিবারিক শাড়ি লুঙ্গি জড়িয়ে সেকালের যুবারা তেমনি বেশি রকিফেলর তো হত না, কারণ তখন তাদের স্কুল-কলেজের নির্দিষ্ট কিন্তু স্পষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল বেশি, যেমন ছিল পরীক্ষা ডিঙোলেই চাকরিবাকরির পছন্দসই নিশ্চিতি না হোক, অন্তত সম্ভাবনা। ইত্যাদি।

সত্যিই তো উন্নয়নপরিকল্পনাসমূহের বীজ ও মহীরুহের ব্যঙ্গে আমাদের জীবনচিত্র আরো উদ্‌ভ্রান্ত, গ্রাম ও শহরের সভ্যতার গন্তব্য ও পথ আর যোগা-যোগ প্রায়ই পীড়াদায়ক ও শুভবুদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। সদ্যপ্রৌঢ় যুক্তরাষ্ট্রের এবং খানিকটা বৃদ্ধ ইংলণ্ড—যা আজও আমাদের পিতৃভূমি, আর ফ্রান্স ও মার্কিনী জর্মানির ঠিক বিপরীত নিয়মান আমরা নানাবিধ বুদ্ধির নির্মূল বিপ্লবসাধন করছি, টাকা আনা পয়সা—মাইলে ক্রোশে সেরে ছটাকে এইসব বিপ্লব কৃষি ও যান্ত্রিক ও ঐতিহাসিক বিধিনিয়মে উৎপাদন বণ্টন বাদ দিয়েই

হয় নি কি? তরুণদের জবাব দেওয়া শক্ত বৈকি। এমন কি বর্ট্রাণ্ড রসেলের মতো মহৎ মনীষায় পাগল আমাদের অব্‌স্কিওর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান মানসে দুর্লভ।

এইসব জিজ্ঞাসা কি শুধুমাত্র আমাদের দুর্ভাগা দেশে উঠছে? নকসালবাড়ির নামে ফুৎকার ছড়িয়ে এসবের উত্তর দেওয়া যায় না। পশ্চিমের সৌভাগ্যবান হিসাবী দেশেও এইরকম প্রশ্ন তো চিন্তাবিশ্বে গুরুতরভাবে আলোড়িত হচ্ছে।

গ্রেগরি বেটসনের মতো প্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের কথাই ধরা যাক। একটি ছোট লেখায় তিনি আদি পিতামাতা আদম ও ঈভের গল্পের এক রূপক দিয়ে নিজের বক্তব্য মূর্তিময় করেছেন। ইডেন উদ্যান থেকে তাঁরা প্রায় স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হলেন এবং এই মর্ত্য স্বর্গোদ্যান—প্রকৃতি থেকে বন উপবন নদী সমুদ্র থেকে উপড়ে ফেলে দিলেন নিজেদের সিসটেমিক বা প্রকৃতিগত তথা মানবতান্ত্রিক স্বভাবটাই এবং পার্থিব বিশ্বেরও সামগ্রিক বৈশ্বিক স্বভাবটাও। বেটসনের মতে পশ্চিমা জগতের উন্নতিবাদী ও প্রত্যক্ষে উন্নয়নশীল সংকল্পপরিকল্পনার ফলপ্রসূ বাস্তবে ঐ দুটি মৌল জৈবিক নীতি বর্জিত হচ্ছে এবং তার ফলে প্রকৃতি তথা মানুষ হচ্ছে ও হবে খণ্ডিত, অসুস্থ, হবে অসম্পূর্ণতর, হবে বিকলস্বভাব। হর্বার্ট মার্কুসের অন্য চিন্তাবিশ্বে দুর্ভাবনার সঙ্গে এইখানে শুদ্ধতর বিজ্ঞানচিন্তার মিল। এইরকম মনন ও মানসের অন্তস্তল থেকেই ফ্রান্সের ছাত্রবিদ্রোহ পেয়েছিল তার গভীরতা মার্কিন প্রাচুর্যেও এবং সাহায্য ও হননীতিতেও এই দুশ্চিন্তার প্রভাব।

শিক্ষার জগতে যাতায়াত ছিল অনেকখানি, তাই ছাত্রদের বিষয়ে ঐ কথাটা মনে আসছে আমাদের দেশের ছাত্রদের সম্বন্ধে বয়স্কদের চালু সমালোচনাটা।

বয়সের গুণে, নাকি দোষে—অভিভাবকদের শিক্ষকদের সমালোচনার মধ্যের মর্মপীড়াটা বোঝা আমার পক্ষে সহজ। কিন্তু জীবনে, দিনগত বাস্তবে বা মনোলোকে সবই তো জড়িয়ে পাকিয়ে থাকে সরুমোটা তারে তারে, তাই ছাত্রবয়সের মনোলোকে সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা মৌলিক ব্যাপার কিনা তাও হয়ে ওঠে জিজ্ঞাস্য। তার কতটা বৃহত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলা, কতটা আর্থিক দুর্গতি বা অনিশ্চয়তা, কতটা অপ্রাকৃতিক ঘেঁষাঘেঁষি অথচ সম্বন্ধহীন ভিড়, কতটা সফলকাম বা বিফলমনোরথ বয়স্ক জগতের মূল্যমানবশত ঘটে, তাও ভাবতে হয়। তার জন্যে বয়স্কদের সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা, এমন কি নৈতিক অনিশ্চয়তাই বা কতটা দায়ী?

তাছাড়া আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কি বিশৃঙ্খলার কিছু কমতি? এমন কি প্রতিবাদী বা ক্ষমতা-ইচ্ছুক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে? লেখক শিল্পীরা অবশ্য জাত-প্রতিবাদী, কিন্তু প্রতিবাদী স্বভাব সত্ত্বেও বোঝা শক্ত নয় যে লেখক-শিল্পী ঐ বিশৃঙ্খলার, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, অংশীদার। এবং সে বিশৃঙ্খলা যা আপাতদৃষ্টিতে কখনও কখনও কারো কারো মনে হতে পারে শিল্পীদের নিজস্ব শিল্পকর্মের ধরনধারণে সঞ্জাত, তাও শুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক নয়, সামাজিক গলদেরই অংশীদার।

বিশেষ করে বয়স্কের পক্ষে তাই সমসাময়িক সমাজ মনোকষ্ট দিতে, উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে বৈকি, কিন্তু সরাসরি বিচারের গদিতে বসাটাও শুভবুদ্ধির লক্ষণ নয়। বেজিস্ দেব্‌রের কথাটা বোধহয় বয়স্কের পক্ষে সর্বাধিক সত্য। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ দেব্‌রের একটি বই আরম্ভ হয়েছে এই সহজ কথায়: আমরা কদাচ বর্তমানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমসাময়িক হতে পারি। ইতিহাস এগিয়ে চলে ছদ্মবেশে, রঙ্গমঞ্চে সে আসে আগের দৃশ্যের সাজমুখোশে সেজে আর আমাদের কাছে তাই নাটকের অর্থটা ঠিক ধরা পড়ে না। পর্দাটা যতবার ওঠে, প্রতিবারই বহমান ক্রমান্বয় আমাদেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। কথাটা সবার পক্ষেই সবদেশে এবং সর্বকালেই সত্য।

তাই এর্নোস্তো চে গুয়েভারার প্রাজ্ঞ মন্তব্যের মর্মগ্রহণেও কারো বাধা থাকে না। সত্যই নতুন সমাজকে—এবং শেষ অবধি প্রতি সমাজকেই, কম বা বেশি, এবং প্রতি যুগেই, স্বকীয় গঠনের তাগিদে অতীতের সঙ্গে কঠিন প্রতিযোগিতায় মাততে হয়, আর, ব্যাপকভাবে, গঠনের কাল স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্বকালেই। ঐ দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তিক চৈতন্যে অনুভূত হবেই, কারণ তা চালু শিক্ষাদীক্ষার ভুক্তাবশেষের পীঠে নতশীর হবেই—যে শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি নির্দিষ্টই হচ্ছে ব্যক্তিকে দুর্বল একক বা বিচ্ছিন্ন করার লোভে, আমদানি-রপ্তানির সভ্যতার কেনাবেচার পণ্যসম্বন্ধের মরিয়া জিদে পরিবর্তনশীল যুগমাত্রেরই স্বধর্মে যা অমোঘ।

হয়তো মনন-নির্ভর জগতে এই জিদ কমবেশি, অন্তত সোজাসুজিভাবে কমবেশি নগ্ন, যদিচ গুয়েভারার চিঠির মন্তব্য আমাদেরও শিল্পীলেখকের পক্ষে চিন্তাগ্রাহ্য। কারণ আমাদের ক্রিয়াকলাপ পণ্যোৎপাদনের ও বণ্টনের হিসাবে নেতিবাচক, অন্তত গৌণ ব্যাপার। তাই ভাবের জগতে বস্তুগত ও মানসগত প্রয়োজনের মধ্যে ভেদাভেদ অনেকটা হয়তো স্বচ্ছ। দীর্ঘকাল ধরে আমরা

চেষ্টা করে এসেছি বিচ্ছিন্নতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সৃষ্টিধর্মী সংস্কৃতির গলির মধ্যে দিয়ে, শিল্পসাহিত্যের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনমন্যতার খিড়কিদোর দিয়ে। কিন্তু এই ওষুধেও সেই একই আধিব্যাধির জীবাণু: শিল্পী অসংলগ্ন নিঃসঙ্গ গৌণ জীব থেকে যায়, যার সাধ কিন্তু সমগ্র নিসর্গ ও জীবপ্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্য। ফলে শিল্পীর লড়াই নির্দিষ্ট হয়ে যায় পারিপার্শ্বিকের অত্যাচারে বঞ্চনাজর্জর মানবিক ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্ন কূপমণ্ডুক আত্মরক্ষায়।

এই আত্মরক্ষার চেহারা কখনও কারো কারো হয়তো নিরীহ, সংকুচিত বা আত্মদানে উন্মুখ, কারো বা আত্মজাহিরে উদ্দাম। এই চেহারাই কি অনেকে দেখেন নি ব্যাপ্তভাবে, অস্পষ্টভাবে, কখনও রবীন্দ্রব্যবসায়ী জোলো ভাষায় ভাবে কখনও বা প্রতিবাদী নেশাক্রান্ত রূপে অন্যত্রও? বয়স্ক অনেকের বয়সের স্বধর্মেই মনে হতে পারে, কীটস্‌কথিত সেই হ্যাংলা বংশপরম্পরার চালচলনের দাবিদাওয়ার উদ্দামতার চেহারা শুধু বেশভূষায় নয়, তার স্বভাবটাই আলাদা। কিন্তু তাই কি একমাত্র সত্য? আমাদের কৈশোরে যৌবনে আমাদের অনেকের মানসিকতাও কি মাত্রায় না হলেও জাতে একই ছিল না? অবশ্য বাস্তব অবস্থা তখন ছিল অনেক কম সামুদ্রিক হলাহলে মথিত। লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা ছিল তখন সংখ্যালঘুর, ফলে সোচ্চার কণ্ঠ ছিল কম, চাকরিবাকরির নিশ্চিতি আত্মপ্রকাশের ও আত্মচর্চার অবকাশ ছিল সেই মন্থর যুগে কিছু বেশি, টাকা যেমন কম ছিল, টাকার পুরুষার্থও ছিল কম, অস্থানে কুস্থানে ছড়াছড়িও কম। প্রতিযোগিতা এখন সর্বত্রই তীব্রতর। এমন কি এখনও যাঁরা হর্তাকর্তা সেই রাজনৈতিক ও সরকারী বেসরকারী নেতৃত্বও ছিল কম মরিয়া ও কম বিচ্ছিন্ন। তাছাড়া ছিল বিদেশী একেবারে নিরেট নির্মম শোষণ ও শাসন যার চোখে এ দেশের প্রায় সব মানুষই সমান অধম। এবং সেইখানে ছিল একটা আপাত-ঐক্য, তাই যাকে বলে সিনিসিজম্‌—নৈরাশ্যজ তিক্ত নেতিবাদ তাও ছিল কম মুখর। এক হিসাবে আমরা খাস ইংরেজের দাসরা হয়তো তুলনায় ভাগ্যবানই ছিলুম।

তাই সমসাময়িক সমাজ যতই উদ্‌ভ্রান্তিকর এলোমেলো, অশালীন, বিশৃঙ্খলাহত লাগুক, মনে হয় আমরা সবাই তো কমবেশি এ ব্যাপারে দায়ী, এ দায়ভাগের ভার আমাদেরও। যতই বিমূঢ় ব্যথিত লাগুক, মনের গোচরে অগোচরে আমরা কি বুঝি না যে এরা ও ওরা এবং অনেকেই সবাই শেষ অবধি আমরাও বটে? অস্বস্তি লাগতে পারে খুবই, নিজেদের মনে হতে পারে

রবাহূত অতিথি যেন, তবু আমরাও তো সরাইখানার পত্তনীদার। আপাত-দৃষ্টিতে যাকে বা যাদের মনে হয় অপরিচিত জগতের বাসিন্দা, যেন বা আগন্তুকমাত্র, তারাও তো পালাবদলে আমাদেরই উত্তরাধিকারী, অচেনাবেশে অল্পবয়স্ক আমাদেরই তির্যক রূপ। তা সে যতই মাঝে মাঝে মনে হোক, বা মনে করিয়ে দিক যে আমরা বিগতপ্রায়। তবু ইয়েটসের মতো নাটকীয় ঢঙে মানব না : এ দেশ বৃদ্ধের দেশ নয় ;

সকলই বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রবিন্দু থেকে চ্যুত,
শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সারা বিশ্বে
রাশ ভেঙে মাতে,
রক্তগন্ধ অজ্ঞান বান বাঁধ ছেঁড়ে
এবং সর্বত্র
অনাঘ্রাত সারল্যের শুভ্র শুচি ব্রত
ডুবে যায় এ-দেশে ও-দেশে ;
শ্রেষ্ঠরা হারায় আস্থা
আর নিকৃষ্টেরা মাধ্যাকর্ষহীন
যত্রতত্র আবেগে উড্ডীন লোভে
আশঙ্কাতে।

এই আমাদের কলকাতা

আজীবন নিজেকে কলকাতার মানুষ জেনে এসেছি, যদিও সুহৃদ্বর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র মতো বংশগত কলকাত্তাই দাবি আমার সাজে না। কারণ পূর্বপুরুষেরা কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন না সেই আদিযুগে, যখন গোবিন্দপুর এবং আর দুটি গ্রামের অন্তিমকালে জলাজঙ্গলে প্রান্তরে কলকাতা মহানগরী নামে ইংরেজের এই কুৎসিত বেঢপ সুন্দরী তাঁর সুখদুঃখময় জীবনযাত্রা শুরু করেন নি। সেই কলকাতার বয়ঃসন্ধি প্রথম দেখেন প্রপিতামহ একশো সত্তর আশি বছর আগে, যার ফলশ্রুতিতে (শব্দটা আজকাল নানা লেখায় নানাভাবে দেখি ব'লেই চালিয়ে দিলুম!) মাইকেল, রাজনারায়ণ, ভূদেবের, সহপাঠী পিতামহ হেয়ার শাহেবের ছাত্র এবং হিন্দু কালেজের (তখন উচ্চারণ তাই ছিল) বৃত্তিভোগী অর্থাৎ স্কলার হন ইংরেজীতে আর ইতিহাসে এবং তাঁর গণ্যমান্য অগ্রজ হন গণিতে।

গোবিন্দপুর, কোম্পানির সেকালের বানানে বা ভাষায়, গোবিন্দপোর-ও বোধহয় খুব একটু প্রাচীন নয়, কারণ এর গ্রামজীবনের শুরু হয় ষোলো শতকের শেষ দিকে, যখন নাকি বেতোড়ের সচ্ছলতায় আকৃষ্ট হন চারটি বসাক বা বৈসাক্ এবং অন্তত একটি শেঠ বা সেট পরিবার এবং বসতি করেন বর্তমানের দামী পাড়া হেস্টিংসের ও এসপ্ল্যানেডের জলায় কাদায়;—তখনও বোধহয় শাহেবরা আমেরিকা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা আমদানি করেন নি। তাঁরাই নাকি একটা বস্ত্রব্যবসার পত্তন করেন, ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রাধান্যের আগে, সুতানুটি অর্থাৎ বাগবাজার থেকে বড়বাজার অবধি অঞ্চলটায়, কালিকোটা বা কলকাতার অর্থাৎ বর্তমান বড়বাজার থেকে ধর্মতলা এসপ্ল্যানেডের উত্তরে,—বোধহয় কালিকট মোহর জাতীয় কিছুর সঞ্চয়-আশায়।

এই সুতানুটিতেই ফিরে আসেন ১৬৯০-তে জোব চার্নক নামে এক প্রাতঃস্মরণীয় রোমান্টিক ঈস্ট ইণ্ডিয়া ভাগ্যের খেলোয়াড়, যিনি আমাদের মানসে খ্যাতিলাভ করেন সতীদাহের শিকার এক সদ্যবিধবা ব্রাহ্মণীকে পতির চিতা

থেকে উদ্ধার করে এবং স্বীয় স্ত্রীরূপে বরণ করে সুখেস্বচ্ছন্দে কলিকাতায় বসবাস করেন। তাঁর বৈঠকখানা থেকেই নাকি সেকালের সেই লম্বা রাস্তা বৈঠকখানা রোড সম্ভূত। এই চার্নক শাহেব নাকি হুক্কা বা আলবোলা টানতেন বৌবাজার আর সার্কুলার রোডের মোড়ের বিরাট পিপুলগাছের তলায় বসে। আঠারো শতকের শেষ দিকে জস্টিসেস্ অব দি পীস্‌-রা একেই বলতেন বৈঠকখানা রোড, যে রাস্তাটা শহরের পূর্বসীমান্ত নির্ধারিত করত আর যার আদি ছিল চৌরঙ্গি রোডের মোড়ে রসপাগলা রোড থেকে আর অন্ত ছিল নাকি চিৎপুর রোডে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে আমার বন্ধু স্থপতি ও পরিকল্পনাবিশারদ পর্সি জনসন মার্শাল তাঁর কয়েকজন সমবৃত্তিক রয়্যাল এঞ্জিনিঅর্ সহকর্মী স্থল ও জলপথে এবং বিমানযোগে কলকাতা অঞ্চল, বাংলাদেশ, তথা ভারতের আরো কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে জীবন নির্মাণমূলক অনেক বিষয়ে জ্ঞানসন্ধান করেন। তাঁদের কাজের ফলে একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রথম থেকেই 'ভূগোলের শিশুবোধ্য সরল' বিচারেও কলকাতা শহর একটি বিরাট ভুলে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষত রাজধানী এবং উৎপাদনকেন্দ্র হিসাবে, বন্দর হিসাবে না হলেও, যার ফলাফল আমরা সর্ববিধ তীব্রতায় আজ হৃদয়ঙ্গম করছি।

অবশ্য কলকাতার পত্তন নিতান্তই বাদশাহী আকস্মিক বদান্যতায়। এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার বঙ্গাল কৌন্সিলের একচক্ষু মনোযোগ সীমিত ছিল নিজেদের ব্যবসাতরাজে বা ফ্যাক্টরিতে (প্রাচীন অর্থে, অর্থাৎ উৎপাদনে নয়), তাদের কিবা দায়ভাবনা দরকার ছিল কৃষ্ণকায় মানবসন্ততির জন্যে এক প্রকৃত অর্থে নগরের পত্তন ও বিকাশের চিন্তার, বিশেষত যখন সে শহরে থাকবে প্রধানত কালো কালো মানুষেরা। অবশ্য জায়গাটা কারবারী কোম্পানির কিছু এবং পরে সাম্রাজ্যের বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গদের অস্থায়ী বাস ও বিলাসস্থান হিসাবেও কার্যকর বটে। আর আমরা কে বা কি যে এই স্বার্থলুব্ধ অজকুলকে দোষ দেব ? তারা তাদের মানস ও সাধ্যানুসারে বুদ্ধিতে যতদূর কুলোয় তার চেষ্টাও করেছিল নিজেদের তত্ত্বাবধানব্যবস্থার। এমন কি, শোনা যায়, সেই ১৭০৭—এই তারা একটা হাসপাতালও করেছিল—অবশ্য ঐ কোম্পানির সেবক স্বজাতির জন্যে। সেটাও কম কথা নয়, যদিও ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন লেখেন : "কলকাতায় কোম্পানির একটা বেশ হাসপাতাল হয়েছে, যেখানে অনেক ব্যক্তি দেহের নানাবিধ দুঃখকষ্ট দূর করতে যায় কিন্তু অতি

অল্পসংখ্যকই ব্যাধিনিরাকরণ বিষয়ে বিবরণ দিতে বেরিয়ে আসে।" বস্তুত, একটি বছরেই কলকাতার ১২০০ শাহেব কোম্পানিদারদের মধ্যে ৪৬০ জন মারা যায় আগস্ট্ থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে—তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যাপুরাণের বিয়োগান্ত নাটকের চেয়ে অনেক বেশি নিষ্ঠুর সত্য ঘটনায়।

অথচ ইংরেজের চিকিৎসাই মুঘল বাদশার ব্যাধি সারিয়েছিল, যার ফলে ইংরেজ কোম্পানি পেয়েছিল সাঁইত্রিশটি গ্রাম-কেনার বাদশাহী অনুমতির দানপত্র এবং কোম্পানির গয়ংগচ্ছ যুগের কপালজোরে বৃহৎ কলকাতার অতিকায় বৃদ্ধি সম্ভব হল। কলকাতার শহুরে গ্রাম্যতার আদিযুগেও দেখা সেই অতিকায় নগরের মস্তি-রোগ, যা বিশশতকেও প্যাট্রিক গেডিস্ প্রমুখ প্রাজ্ঞ মানবতাপ্রেমিক বিজ্ঞানীরা ভ্রান্তিদুষ্ট ভাবতেন। ঐ সব গ্রাম এখনও রাস্তার নামে বা পাড়ার নামে স্মরণীয়—বেলগাছিয়া, উল্টাডাঙা, সিমলা, বাগমারি, শেয়ালদা, তিলজলা, এটালি, চিৎপুর, এমন কি সাক্ষাৎ বিশ্ববিরাজ চৌরঙ্গিও। অবশ্য লালবাগ ইংরেজের ধনমানের কালস্রোতে মিশে গেছে; লালদীঘি আছে, যাকে ঘিরে "জীবনের পথ মরে অনন্ত ব্যথায়, আর্ত এক নগরের প্রতিভূ রূপকে, নিরুদ্দেশ মানুষের ভিড়ে পায়ে পায়ে।"

সাধে কি আর আমাদের এক মহান মানবপ্রেমিক, নেতৃপুরুষদের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে সুকুমারবৃত্তি, তিনিও কলকাতাকে বলেছিলেন নিশি-পাওয়া বা দুঃস্বপ্ন শহর। যে নিশি-পাওয়া দুঃস্বপ্নময়তা আমাদের দিনকে রাতকে, আমাদের অহিংসা হিংসাকে দমকে দমকে আচ্ছন্ন করে, যা আমাদের খাদ্যাভাবে জলাভাবে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় দৈনিক জীবনকে ছেয়ে ফেলে নানা চেহারার নানা গ্লানির আধিব্যাধিতে। জওহরলাল চিনতে পেরেছিলেন শুধু তার প্রকাশ্য জীবনের কয়েকটি পাশ থেকে দেখা মুখের চেহারা আর তাও দুএক ঝলকে, আমরা যা নানাভাবে নিত্য দেখি আর কমবেশি চিনি। কলকাতা তো আমাদেরই শহর, মুখ্যত ভুঁই-ফোঁড় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিকা-ধারীদের এক পড়ে-পাওয়া শহর—কথাটার মানে যতই অনির্দিষ্ট হোক,—যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হয়তো কয়েকশো উচ্চবিত্ত লুম্পেন-ধনিক! এবং হাজার হাজার নির্বিত্ত মানুষ আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ের দুঃখে কষ্টে আনন্দে উল্লাসে।

কিন্তু কলকাতার করুণা ও রুদ্ররসের উৎস বর্তমান ক্ষ্যাপা কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখকষ্টের পরিধি ছাড়িয়ে চলে যায় কলকাতার

কুয়াশাচ্ছন্ন জন্মকালে সেই ব্যবসালুব্ধ ও নববীজসমৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রুগ্নতায়। তার জন্মটাই আপতিক, ঘটনাচক্রের আকস্মিক যোগাযোগে, ইতিহাসেই যার ব্যাপ্ত ব্যাখ্যা এবং ইতিহাসকে পাকড়ে এনেই তার চিকিৎসা ও আরোগ্যস্নান। আমাদের ভালোবাসার অযৌক্তিকতা বক্তৃতায় সারে না অথবা যুক্তিযুক্ত ঔদাসীন্যে মেনে নিতেও পারে না এই মাতৃসমার দুশ্চিকিৎস্য দুরবস্থা।

(২)

কম বয়সে অগ্রজ ও সমকালীনদের মতো আমিও কলকাতার আপনভাব জেনেছি এবং সেকালে তার জন্যে বাঙালীসাহেব না হলে কারো পক্ষে লজ্জাবোধ করাটা দরকার হত না। মনে আছে, আমার সেকালে একসময় পূর্বোল্লিখিত বন্ধুবরের স্বাস্থ্য কলকাতায় ভালো থাকছিল না এবং যখন অনার্দ্র পাহাড়ে কালিম্পঙে তাঁর পিতার খাসা বাগানবাড়িতে কিছুকাল থাকার কথা উঠেছিল, তখন তিনি বলেন যে অসুস্থতায় তাহলে মাথাটা আক্রান্ত হবে। কয়েকবছর পরে এই জবাব আবার শুনি, যখন এরিক দা কস্তা নামক সমধর্মী বা কম্যুনিস্টবিরোধী নামক ভারতবাসী সিংহলী তাঁর এক বন্ধু নয়াদিল্লিতে থাকার প্রস্তাব তোলেন। কলকাতার ভালোবাসায় তখন কারো লজ্জার কারণ হত না। এমন নয় যে তখন আমাদের শহরের দোষত্রুটি, অভিযোগের কারণ ছিল না। বিশেষত নয়াদিল্লি বা বিলেতী শহরের তুলনায়, উত্তর ইওরোপের দেশ কয়েকটি বাদ দিয়েই বলছি অথবা ইয়াংকি নয়া নয়া শহরের কথা। কিন্তু শিশুদের মাতার মতো বা অসদ্‌গুণমণ্ডিত স্বামীদের বঙ্গীয় স্ত্রীদের মতো কলকাতা ছিল তলে তলে আমাদের আপনজন। তাই তো আমাদের আড্ডায় গল্পে কবিতায় কলকাতা শরীরী হত।

সেই দ্বিতীয় তৃতীয় যুগেও আমরা অনুভবে জানতুম কলকাতার দুটো চেহারার বা তার দুটো আবেদনের মধ্যে ফারাকটা আর জানতুম যে আমরাই আসল কলকাতার মানুষ। আমাদেরই মানসের দ্বান্দ্বিকন্যায়ে উচ্ছ্রিত হয়েছিল এই রহস্যময় আসল শহরের উপলব্ধিটা। তাই এই বেশে বেয়াড়া কিন্তু মনেপ্রাণে সুন্দরী শহর প্রেরণা দিত গদ্যপদ্য রচনার অথবা গগন ঠাকুরের ছবির। এমন কি কাব্যগতভাবে ইংলণ্ডপ্রবাসী এলিঅটের পোড়ো

জমির দেশের নাগরিকজীবনকেও আমাদেরই মতো বিন্যস্ত করা যেত। বস্তুতপক্ষে, বদলেয়ারের সেই স্বপ্নালু শহর একেবারে কালাতিক্রান্ত পুরোনো হয়ে গেছে তখনই, সেই সাতটি বৃদ্ধের আর সাতটি বৃদ্ধার প্যারিস।

কলকাতার এই কাব্যসঞ্চারী শক্তি সম্ভব হয়েছিল, কারণ আমাদের কলকাতাতেই তবু কিঞ্চিৎ যথার্থ জীবন্ময়ত্ব ছিল, যেটা ছিল না ইওরোপের ভারতীয় ফটক বোম্বায়ের, ফোর্ট সেন্টজর্জের মাদ্রাজ শহরের অথবা মোটেই ছিল না জর্জ ন্যাথনিয়াল কর্জন—যিনি স্কুল থেকেই নাকি ছিলেন এ ভেরি স্থপিরিঅর্ পর্সন্—সেই মস্ত শাহেবের লট্ইয়েনসিআন নয়া দিল্লিতে। মার্কিন ক্রোড়পত্নীর স্বামী বড়লাট বাহাদুরও শহরের জীবন সৃষ্টি করতে পারেন নি। অন্যপক্ষে নিশিপাওয়া শহরের জন্ম হয়েছিল একেবারে ভাবনাচিন্তা দরদ বিনা, ভাগ্যপরীক্ষায় মরিয়া প্রায় ডাকুর মতো ব্যবসায়ী এক কোম্পানির উপযোগের তাগিদে—যত সস্তায় কাজটা সারা যায়।

তাই তিক্ত এবং একেবারে ব্যর্থ আত্মসান্ত্বনায় আমরা মনে করি কলকাতার সেই প্রথম হাসপাতাল বিষয়ে হ্যামিলটনের মন্তব্য, তাই সমর্থনে ঘাড় নাড়ি সেই বুদ্ধিমতী শ্রীমতী কিণ্ডরসলির কথায় যিনি মন্তব্য লেখেন বহুকাল আগে, ১৭৬৮-র জুন মাসে। আর অবাক লাগে কি ক'রে তিনি সুদূর কলকাতা উন্নয়ন ট্রস্টকে তখনই প্রায় যেন দেখতে পান, এমন কি মূষিকপ্রসবা আজকের কলকাতা অতি নাগরিক পরিকল্পনা সংস্থাকেও। ১৯৬৬-তে আমাদেরই মতো তিনিও শোচনা জানান: "লোকে সমানেই জমি জোগাড় করছে আর ইমারত বানিয়ে যাচ্ছে নিছক নিজের রুচি বা অরুচি অনুসারে, বুদ্ধিবিবেচনা বাদ দিয়ে, শহরের সৌন্দর্য বা সামগ্রিকতা বা নিয়মানুগতা বিসর্জন দিয়ে। অধিকন্তু ভালো ভালো ইমারতের চেহারা নষ্ট হয়ে যায় আশেপাশে ছোট ছোট খোড়ো ঘরের বা এবম্বিধ বিড়ম্বনার ভিড়ে যেগুলি তৈরি করেছে শাহেবদের ভৃত্যকুল নিজেরাই, ঘুমোতে পাবে বলেই: ফলে শহরের ইংরেজপাড়া গোটাটাই এবং ঐ পাড়াটাই সব চেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে হয়েছে জমকালো আর অতিদুস্থ বাড়িঘরের মরা দেয়াল, কুঁড়ে, আড়ত ঘর এবং জানি না আরো কতকিছুর এক উদ্দাম সমষ্টি।"

আমরাও আজও জানি না। তবে ইংরেজপাড়ার ঐ মহিলা মিসেস্ কিণ্ডরসলির থেকে ভিন্ন আমরা কলকাতাকে ভাবি আমাদেরই কলকাতা। নাকি বলা উচিত, আমরা তাই ভাবতুম। আমাদের সেই চেনা মাতৃনগরীর

স্মৃতি আজও উজ্জ্বল, আজন্ম স্মৃতি প্রায়ই যা হয়,—রবীন্দ্রনাথের কলকাতা, গোরার কলকাতা, গল্পের কবিতার কলকাতা, গানের সভার ভাষণের বক্তৃতার কলকাতা। আর পিতৃপুরুষদের স্মৃতির কলকাতার স্মৃতিও বটে, রামমোহনের আত্মরক্ষার্থে আধখানা পাঁঠা ও ছয় কাংস্যপাত্র কারণবারি খাওয়া হাতে তরোয়াল নিয়ে নিয়ে ঘোরার কলকাতা। বিদ্যাসাগরের কলকাতা, যিনি সংস্কৃত কলেজের পথে, বর্তমান ইউঃ ইনস্টিটিউটের কাছে খোয়া-রাস্তায় দেখলেন কলেরা রোগী কাতরাচ্ছে এবং কিছু ভাবনাচিন্তা বিনাই বিশুদ্ধ মানব হৃদয়বৃত্তি-বশত সেই মলার্দ্র প্রায়মুমূর্ষু বিসূচিকারোগীকে ঘৃণাহীন নিরাতঙ্ক দুইহাত দিয়ে তুলে নিয়ে চলে গেলেন কাছের—একমাত্র—হাসপাতালে এবং তর্ক করলেন ডাক্তার শাহেবদের সঙ্গে, সংক্রামক রোগ বলে মানুষটি কি চিকিৎসাবিনাই মারা যাবে?

জীবন্ত শহরের যথার্থ বাসিন্দাদের পক্ষে যা সঙ্গত, সেই আঞ্চলিক আত্মপর বোধ তখনকার কলকাতায় দেখা যেত, এখন উগ্রতা থাকলেও সেই স্পষ্টতা বোধহয় অতটা নেই, সেকালের পাড়া বা হিন্দিরমহল্লা আজকাল নতুন নতুন ভিড়ে আর উন্নয়নে প্রায় চারিত্র্যহীন। ঐ প্রবল স্থানীয়তার মধ্যে একটা বেশ সত্তাবৈশিষ্ট্য ছিল, যা হয়তো এখনও উত্তর কলকাতার বা কালিঘাট-ভবানীপুরের পূর্বাঞ্চলে কিছুটা জীবিত। তবে তখন যে চোখ বুজে হেঁটে যেতে যেতে কোন্ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বা কোন্ পাড়ার বা রাস্তার সে বৈশিষ্ট্য চেনা বোধ হয় আজ আর সহজ নয়। যার জন্যে ইটপাটকেল বা সোডাওআটর্ বোতলের স্থানীয় গর্বের লড়াই এড়াতে সেকালে পদচারীকে গলি বদল করতে হত?

সেই সীমিত শহর আরো সহজে চেনা জানা যেত। পায়ে হাঁটাও বেশি প্রচলিত ছিল। বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি হলে ময়দানে দাঁড়িয়ে তথা ঘরে মুখোমুখি ব'সে কথা বলতে পারেন ভালো, একদিন বলেছিলেন যে তিনি ছ বছর তালতলা থেকে কলেজ ও ইউনিভর্সিটি যাওয়া-আসা হেঁটে করাতেই অভ্যস্ত, তাই ছিল স্বাভাবিক, যদিও ট্রামে যাওয়া তুলনায় অনেক সহজ ছিল, এমন কি নতুন বাহন বাসেও। এখন সে কলেজ স্কোয়ার পাড়াও নেই, নেই ইউনিভর্সিটির নকল গ্রীক কিন্তু ঐতিহাসিক থামও নেই, পটলডাঙাই প্রায় গঞ্জের হাটের, এক বৃহত্তর মাধববাবুর বাজারের অতিস্ফীত নকল আর জনযানবাহনে ঐ অঞ্চলে ওঠা-নামা প্রায় অসাধ্যসাধন, তবু নবীনেরা দশপা

হাঁটার কথা ভাবতেই পারে না। এখন নবযৌবন ভাবতেই পারে না যে আমরা সকালে বা সন্ধ্যায় চুপচাপ হাওয়ার মুখে ব'সে বেড়াতে পারতুম—সেই হাওয়ায় ও বেগের বিলাসে ভাবনা চলত বিলাসে ট্রামগাড়ি বা খোলাছাদ দোতলা বাসে চেপে। শ্যামবাজার আলিপুর বা কালিঘাট, এমন কি টালিগঞ্জ বা বেহালা পর্যন্ত ভ্রমণ কী আরামপ্রদ ছিল নিম্নআয় বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে। এ-ই হৌসম্যানের বা এলিঅটের মতো কবিতার উড়ো পঙ্‌ক্তি-পর্বও এই বায়ুভুক প্রকাশ্য কিন্তু নিভৃত গতির মাহাত্ম্যে মনে মনে মধুচক্র গড়ত।

মজাও হত, নির্দোষ, নিখরচা, প্রায় ছেলেমানুষি। একবার দোতলার খোলা ছাদে যখন জনবিরল চৌরঙ্গি কেটে বাস ছুটেছে, তখন ধারের বেড়া-গুলো এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল, কারণ ঢিলে স্ক্রু, নটবলটু সব খুলে পড়েছে। উপায়? সবাই নেমে যান, উত্তার যাইয়ে। কিন্তু নামব কেন? আর কোথায় নামব? দশবারোজনের প্রস্তাব হল, এদিকে ওদিকে যাত্রীরা নিজদেহভার দিয়ে এঁটে বসে থাকব, যাতে বেড়া নড়বড় করলেও গড়িয়ে রাস্তায় পড়ে যাবে না। তাই করা হল, সবাই অক্ষতদেহ ধর্মতলা পৌঁছে গেলুম।

অবশ্য হাওয়া-খাওয়াটা বেহালা টালিগঞ্জে ট্রামে বেড়ানোর চেয়ে বেশি জমত গঙ্গা ফেরিভ্রমণে, চাঁদপাল থেকে রাজগঞ্জ বা ওদিকে শিবতলার ঘাট, কিন্তু সে নদীই এখন গঙ্গাযাত্রায় কাতর আর ঐ ফেরি চলাচলও বন্ধ। বালকরা সে কলেজ স্কোয়্যার থেকে বগিগাড়ি চেপে মনোহরপুকুরে আত্মীয়ার বাড়ি যাওয়া প্রায় জঙ্গলে যাওয়ার উত্তেজনা জোগাত, অথবা গ্রামান্তে চড়িভাতির যেন একটা নিরাপদ এডভেঞ্চর। উন্নয়ন তখনও ক্ষেপে ওঠে নি, জনাতিশয্যও নয়, ভবানীপুরের দক্ষিণে তখনও শেয়াল ঘুরত প্রচুর এবং সর্পকুলও। আর লেকগুলি ছিল ডোবা আর জলা, ধানক্ষেতও ছিল প্রচুর এবং বন্যভাবে রক্ষিত বা অরক্ষিত বাবুদের বাগান। সে সব গেছে, যেমন গেছে নানাবিধ ফেরিওলার ডাক বিশেষ বিশেষ উচ্চারণে এবং গলার নানান্ কালোয়াতি চালে। আজ হাসি পায় যখন মনে পড়ে, বাড়ির সামনে সংস্কৃত কলেজে হিন্দু স্কুলের উঁচু ভিতের তলায় বায়ুচলাচলের সব ফোকরে শেয়াল ডাকত আর যাতায়াতও করত আমাদের মনে বিলক্ষণ একটা উদ্বেগ জাগিয়ে।

তখন কলকাতায় যাতায়াত অনেক সহজ ছিল, ফলে আত্মীয়বন্ধুর বাড়ি বা আড্ডায় যাওয়া-আসাটা অভ্যাসে পরিণতি পেত। যাদের ল্যাণ্ডো বা ব্রুয়াম, বগি বা পালকি ঘোড়ার গাড়ি অথবা সদ্য আমদানি মোটরগাড়ি ছিল

না তাদেরও, বা বলব তাদেরই। ফলে ক্রমত ঐ আড্ডা বা নিজের ও পরের সময় নষ্ট করার সেই বঙ্গীয় রীতিটা, গম্ভীর ও হালকা আলাপে, দুনিয়ার সব কিছু বিষয়ে ঘোরতর তর্কে বা নিছক গাল-গল্পে কিংবা তাস বা দাবা বা পাশাই খেলায়—যে সবই বোধ হয় আজকাল প্রায় প্রাগৈতিহাসিক। কারণ শুনেছি যে রাস্তার গলির মোড়ে কিংবা সিনেমায় বা কফিহৌসের ভিড়ে গোলমালে সে আড্ডা ব্যাপারটা ঠিক হয় না।

বরং, এখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে হলে টেলিফোনে দিনক্ষণ স্থির করে যেতে হয়, যাতে আড্ডার প্রেরণা বা অপূর্বকল্পিত আবেগ ঠিক থাকে না। তাছাড়া কজনেরই বা আমাদের জগতে মোটরগাড়ি আছে? ফলে সময়মতো পৌঁছনো অনিশ্চিত, কারণ ট্রামবাস ঠিক নিত্যনিয়মে পাওয়া শক্ত, দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া কপালের ব্যাপার, আকস্মিক দুর্ঘটনাও আছে এবং তারপরে হুব্রিস ও নেমেসিসের পথস্থ নাট্য। অথবা আকাশ মিনিট পনেরো কুড়ি প্রবল বর্ষণ দিলেন অথচ ট্রামবাস কোনটাই ময়ূরপঙ্খী নয়।

সত্যিই বলতে পারেন কলকাতার জীবনযাত্রা দিবারাত্রি নিশিপাওয়া। এখন কলকাতা সত্যিই নানা দুঃখকষ্টের, অভাব অসুখ বঞ্চনার গ্লানির অবর্ণনীয় শহীদ। তাই তার মেজাজ দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে, কখনও নিরুৎসাহ মর্ষণাহত তিক্ত নৈরাশ্যে কাবু, কখনও উদ্বায়ু আবেগে ক্ষ্যাপা। কিন্তু কলকাতায় নানারকম লোক থাকলেও সে আজও "ব্লাজে" হয় নি, প্রাচুর্যবিলাসাবসন্ন তথা কথিত সভ্যতায় বিকৃতক্লান্ত নয়। অন্তত কলকাতার মধ্যে যেটুকু আজও প্রাণময়। খাদ্যাভাব, পরিষ্কার-অপরিষ্কার! স্থানাভাব, জলের অভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য ওষুধ চিকিৎসা সব জিনিসই দুর্মূল্য ও থেকে থেকে নিরুদ্দেশ—এ সবই এখন উগ্রতর। সৌভাগ্যবান সব শহরের পক্ষে কল্পনা করার ইচ্ছা হওয়াও শক্ত কলকাতার দুর্ভাগ্য—যেখানে বাঁচাটাই একপ্রকার বীরত্ব। ফলে ঐ সব শহরবাসীরা ভাবেন এই নগরমাতাটি বড় নালিশ করেন, কান্নাকাটি করেন বা মারধোর করেন আর তাঁর সন্তানদের রাগীবাবু হবার শিক্ষা দেন, যেটা ভূতপূর্ব-কালের একদা প্রিয়পাত্র গোপাল-দের পক্ষে প্রায় স্বাভাবিক। বিদেশীরা বিমূঢ় বেজার তো হতেই পারে, ইল্লিদিল্লির একে অপছন্দ অকারণ নয়। অন্যায়ের আকস্মিকতায় তথা গুরুত্বে আহত ধৈর্যচ্যুতি তার থেকে থেকে হয়, কার্যকারণ তালগোল পাকিয়ে যায়, অন্যদের কাছে সে একটা বিড়ম্বনা বিবেচিত হওয়া দুর্বোধ্য নয়।

কলকাতার নির্মনন পণ্যবাণিজ্যে নোংরা আকাশের ক্রন্দসীতে ট্রাজেডি ভেসে বেড়ায়। হঠাৎ হঠাৎ কলকাতায় বীরত্ব হাওয়ায় ভাসে, ভুল থেকেও নির্ভুল থেকেও, ট্রাজেডিতে যা সম্ভব, কখনও নতমস্তক, সুপ্তপ্রায়, কখনও মহীয়ান, ঐশ্বর্যদীপ্ত। যেমন হয়েছিল এক ফেব্রুআরি দিনে ১৯৪৬ এ, অথবা যখন প্রায়শ্চিত্তে নামলেন বেলগাছিয়াতে হিন্দুমুসলিম সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা ১৯৪৭এর ১৫ই অগস্টে ভোর থেকে, কিংবা রুশ নেতাদের প্রকাশ্য ময়দান-সভায়। মানতে হবে সবটাই অনির্ধারিত, পারদতুল্য। কিন্তু মেজাজী এই কল্কির জাত-তেজী ঘোড়াকে নৈশ দুঃস্বপ্নের ঘোড়ী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো বা কেউ বলবেন যে দুঃস্বপ্নঘোড়ীর রাজত্ব নির্বিকার যে চব্বিশঘণ্টা তাতেও বলবৎ তার নিষ্ক্রিয় দুঃসাহসের মধ্যে—উইলফ্রিড ওয়েনের ভাষায়, যেখানে "কিছুই ঘটেনা", যে অবস্থা আবাব ইয়েটসের ভাষ্যে ট্রাজিকও নয়, কারণ তাতে ট্রাজেডির উল্লাস উদ্দীপনা নেই। অবশ্য সেটাও এক হিশেবে হিরোইক, বীবত্বপূর্ণ, কাবণ তাতে ছাঁটকাট ট্রাজেডিব কোনো গ্লামব বা আপাতকৌশলও নেই।

ভাবুন একটা গোটা দেশের জনগণের কথা, যাদের মধ্যে স্বদেশ-কে বিভক্ত দুই দেশ করা হয়েছে, যারা বংশানুক্রমে বেঁচে এসেছে গ্রামীণ সন্তোষে ভালো ও পর্যাপ্ত চাল তেল ঘি ডালের মাছের দুধের ও তরি তরকারির সাহায্যে পুষ্ট নিত্য অভ্যাসে। কিন্তু এসব প্রাথমিক, জৈব অভাব অনটন, দুর্মূল্যতা, চিরস্থায়ী ব্যবস্থার মতো পাকা সব দুঃখকষ্ট, এমন কি পূর্বোক্ত শোধিত ও দূষিত জলসরবরাহের দুববস্থা—যেটি আবার বিদেশীর কাছে অবিশ্বাস্য রহস্যবিশেষ। কিছুই কলকাতাকে এই অতিনাগরিক আজন্ম আপতিক অঙ্গবৃদ্ধিরোগে দুস্থ অকালে জরাগ্রস্ত এই কৃষ্ণকায় পোড়ো ধ্বংস-মুখ দেশের রাজধানীকে সিবিলের মতে রাজি করাতে পারে না—সে কিছুতেই মরতে চায় না! যদিও তার অর্ধপিতৃকুল চার্নকের দেশজ আর রাজন্যবর্ণিক 'রাজ' আজ মৃতপ্রায়। আমরাও নগরীজননীকে বিদায় দিতে চাই না।

এবং সৌভাগ্যক্রমে এ যুগে—ঐতিহাসিক অর্থে. কবিদের জন্মদশক অর্থে নয়, অত দ্রুত মরেও না. যেমন উজ্জয়িনী ইন্দ্রপ্রস্থ বা গৌড়পাণ্ডুয়া মরেছিল। একালে মহাযুদ্ধই শুধু জনপদ শহরকে মারতে পারে এবং সে ক্ষেত্রেও অজেয় জনসাধারণ শহরকে—যেমন স্তালিনগ্রাদকে ড্রেসডেনকে, বার্লিনকে

পুনরুজ্জীবিত করে। এবং আপনি যদি মুষ্টিমেয় সেই বিদেশীবন্ধুদের একজন হন, যাঁরা কলকাতার বাঙালিত্বে ডুবেছেন তার পেশাদার বা আপনগরজী থিয়েটরগুলি দেখেছেন, দেখেছেন নিত্যনব চিত্রভাস্কর্য প্রদর্শনী, শতশত পত্রপত্রিকা, হৃদবৃত্তিতপ্ত বন্ধুত্ব, হাসিকান্নার মিশ্র মেজাজ, তাহলে আপনারাই আমাদের বলবেন যে আপনারা আমাদের সঙ্গে একমত—এবং নানাবিধ মতামতে আমরা বিত্তবান—তাহলে আপনারা আমাদের জীবন-যাত্রার নতুন অর্থে দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানি সত্ত্বেও, জনসাধারণের অভাব রাগ বিষাদ সত্ত্বেও, কলকাতার যেটুকু ক্রমান্বয়ে কুশ্রীকরণ সত্ত্বেও অস্পষ্টভাবে প্রাণবান, অনাঘ্রাত, অর্থাৎ যা লোভ ও মূর্খামির হাত এড়িয়ে বেঁচে আছে, তারই জন্যে আপনাদের থেকে থেকে ইচ্ছা হবে স্বর্ণময় কতিপয় দেশ থেকে ফিরে আসতে, এই মোর দুর্ভাগা দেশে।

জিম্ ও তার সমমনাদের মতোই আমরাও আশাবাদী: শুভবুদ্ধি ও শুভাচার ও কর্ম নিশ্চয়ই দীর্ঘসূত্রতা সত্ত্বেও জয়ী হবে—হতে পারে হয়তো বা আমারও জীবদ্দশায়! যে আশা সরল সত্যভাবে ঘোষণা করেন প্রাজ্ঞ প্রেমিক বৈজ্ঞানিক স্কট্ কয় দশক আগে: "নগর-পরিকল্পনা-পর্যালোচনায় যারা জড়িত…তাঁরা শেষ অবধি উপলব্ধি করবেন যে চারদিক পরিষ্কার করার পরিচ্ছন্ন রাখার, বাসস্থান তৈরির আর বাগানবাগিচা করার সরল সাধারণ কাজ কয়টিতেই হচ্ছে বিত্তসাচ্ছল্য, স্বাস্থ্যমানমূল্য, সভ্যতার পুরুষার্থ শিল্প-সৌন্দর্যের পুরুষার্থ, এককথায় মানবজীবনের পুরুষার্থ বা সার্থকতা।

"এই মূল্যায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থানীয় বড় বড় ও ছোট ছোট পণ্য-শিল্পোৎপাদন, উৎকৃষ্টতর ও প্রচুরতর খাদ্যসরবরাহ এবং তার উৎকৃষ্ট প্রয়োগ ব্যবহার: সর্বোপরি এইসব উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আদর্শের সঙ্গে হাতে-মনে সাফল্যের পরিচিতি।"

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসার গরজে

"There was a last day with his mother. Looking with her across the Channel, he repeated a favourite passage from Rabindranath Tagore : When I go from hence, let this be my word ; that what I have seen is unsurpassable"—The Poems of Wilfrid Owen, ed. by E. Blunden.

আমরা যারা অন্তত বয়সের গুণে ভাবতে পারি যে আমরা রাবীন্দ্রিক বাংলার তথা ভারতবর্ষের লোক, আমরা একটু আশ্চর্য হই বৈকি যখন শুনি যে, আমাদের নবাগত বন্ধুবান্ধব অনেকেই ঐ জগতে নিজেদের বহিরাগত মনে করেন। তাই কি তাঁরা বাংলাদেশকে, বাংলা সাহিত্যকে দুশো বছর অথবা পাঁচশো বছরেরই প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন এবং এক কাল্পনিক ইংরেজি-মার্কা দশক নামক ঐতিহাসিক যুগসংখ্যায় নিজেদের চিহ্নিত করেন। সে কারণেই কি তারা ঐতিহ্যকে সৃষ্টিময় করতে চান না পদে-পদে নবার্জিত চেষ্টায় চেষ্টায়?

অবশ্য স্বদেশী যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু অবধি—অথবা ১৯৪৭ অবধি বাংলার বৃহৎ ও গভীরভাবে তীব্র অভিজ্ঞতা হয়তো ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে না হলেও নিজের-নিজের শক্তিমত্তাকে ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত করার অভিজ্ঞতা তো বাংলার লেখক-পাঠকের থাকবার কথা। অবশ্য এখন বোধহয় রাবীন্দ্রিক কালান্তরের পরে—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু—এদের প্রয়াসের পরে, সাহিত্য বা কাব্যচর্চা অনেক সহজ হয়ে গেছে বলে যে কোন লেখককে প্রথম থেকে বেশী প্রশ্রয় দিতে পারে।

নাকি নিজেদের বয়স্কতার সুযোগে আমরা ভুলে যাই ঐ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড বাস্তবতা? এমন কি রবীন্দ্রনাথের সশরীরে উপস্থিতির মাহাত্ম্য, আমাদের চোখের সামনে আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে? যে মাহাত্ম্যের কাছে এসে এজরা পাউণ্ড যাঁর বয়স হল একাশি, তিনিও লিখেছিলেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে :

"উদ্ধৃতির জন্য যে কবিতাই তুলি পরেরটা পড়ে ভাবি বুঝি ভুল করলাম।

ঠাকুরমশায়ের ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনা মেশাতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে দুই-এর সম্পর্ক এত নিকট যে, আমি দুটো কথা বলব কিছু ব্যাখ্যা না করেই সোজাসুজি।

ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে যখন আসি তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর পরনে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র, মোটা ভারী কাঁটাওয়ালা গদা।"

বোধ হয় পৃথিবীর কোনো দেশে এমন এক বহুধাবিস্তৃত সামগ্রিক রচয়িতা ও কর্মী-প্রতিভা মেলে না, রবীন্দ্রনাথ একাই তাই আমাদের দেশে নানা বয়সে বহু লোকের মনে এবং বহুভাবে নানা আন্তরিক প্রয়োজনের সময়ে বিরাট সত্য হয়েছেন, এবং থেকে গেছেন, আবেদনে উদ্বোধনে সান্ত্বনায় প্রেরণায়। যেন প্রায় ঐশ্বরিক প্রকৃতির মতো, বছরে বছরে ঋতুতে ঋতুতে সংকট ও উন্মোচনের আনন্দরূপেন বিভাসিত শত রূপে। অধিকন্তু সাক্ষাৎ ব্যক্তি-স্বরূপের মাহাত্ম্যেও।

বন্ধুবর অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় বেশ কিছুকাল আগেই লেখেন রবীন্দ্রনাথ জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথও বটে। কারণ তাঁর শিল্পকর্মাবলী যেমন জীবনোৎসারিত, তেমনি তাঁর জীবনও ছিল এক বিবাট শিল্পরচনা। রামেন্দ্রসুন্দরকে যেমন তিনি বলেছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দব! তোমার সকলই সুন্দর। তাঁর জীবন, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর বিচিত্র রচনাবলী, সবই সুন্দব।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ সহজাত শক্তি সৌন্দর্যমত্তা ও অর্জিত সিদ্ধির এক অসাধারণ ব্যক্তিস্বরূপ, কীটস-বর্ণিত সেই ইগোটিস্টিকল সব্‌লাইম ও নেগেটিভ কেপেবিলিটির আশ্চর্য এক সৃষ্টিধর্মী মিলন—আধুনিক ভাষায় যাকে বলে অহম্ ও একাত্মযোগের চিরদ্বন্দ্বের ক্রমান্বয়িত সমাধান, যাঁর জীবনই ছিল এক মহান্ শিল্পরচনা, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামকরণে—যিনি স্বয়ং এক কবিতা।

বছর দুই তিন আগে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর বক্তৃতামালার 'An Artist in Life' নামাঙ্কিত সংকলনগ্রন্থ যখন পাঠের সুযোগ পেলুম তখন খুশি লেগেছিল। নীহারবাবুর রবীন্দ্র-পাঠ এই একই দৃষ্টিতে। যখন তিনি বইটির বাংলায় বিস্তৃততর ভাষ্য আমাদের উপহার দেবেন, তখন আশা করি তিনি পাণ্ডববর্জিত সিমলা ছেড়ে আবার কলকাতাবাসী হবেন, ফলে বইটি আরো নিখুঁত হতে পারবে।

এই বিখ্যাত তিনবন্ধুর মতো আমারও মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এত বছর পরেও আজও মনে হচ্ছে যে, আমরাই সৌভাগ্যবান। কারণ ত্রিশ চল্লিশ বছব এমনকি পঞ্চাশ বছর আগে তাঁকে কাছে দেখাব, কথা শোনার সুযোগ আমরা পেয়েছি, ছবি আঁকতে দেখেছি, কবিতা পড়া শুনেছি, এমন কি গান করতেও শুনেছি—"আমার কি আর সে গলা আছে?" এই মন্তব্য সমেত। তাঁর প্রকাশিত সর্ববিধ রচনা ও কর্মকীর্তির সামগ্রিক সচেতনতা একই সময়ে একক মনে রাখা যেমন দুরূহ, তেমনি স্বাভাবিক সহজ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সহজাত ও অর্জিত সৌন্দর্য-বৈভবের তিরিশ চল্লিশ বছরের আগের উজ্জ্বল স্মৃতিকে স্পষ্ট মনে রাখা। এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের এই গরিমা তাঁর অসাধারণ সুশ্রীতা নয়, যা তাঁর যৌবনেই বহু লোককে মুগ্ধ করেছে। প্রবীণ বয়সে, বোধ হয় প্রায় স্বদেশী যুগ থেকে তাঁর দুর্লভ কান্তি আরেক গভীরতা পেয়ে গেল, মানবিক ব্যক্তিস্বরূপের পরিণত গরিমায়। রূপ হয়ে উঠল সৌন্দর্য।

ব্যক্তিস্বরূপ বা পর্সন্যালিটি সব সময়েই অর্জন করতে হয় এবং রাবীন্দ্রিক ব্যক্তিস্বরূপ সংবর্ধিত হয় তাঁর জীবন ও কর্মের একাগ্রনিষ্ঠায়, প্রবল জীবনীশক্তিতে, প্রায় অমানুষিক নিত্য পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে, মানবজীবনের শুভার্থী সর্বপ্রকার কর্মের মধ্যে দিয়ে। অনেকেই এই কর্মকীর্তির মহানদী অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন, কম-বেশি ক্ষমতা ও সময় অনুসারে এবং আমাদের বয়স্কতার গৌরব যে সাক্ষাৎভাবে এই বিরাট কর্মময়তা অন্তত কিছু কিছু দেখতে পেয়েছি। তাঁর কবিতা পাঠ, গান, ছবি আঁকা, নাট্যাভিনয় ও প্রযোজনা, আলাপ-আলোচনা, তাঁকে নিছক গল্প করতে দেখার শোনার অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথের কর্মমাহাত্ম্যের পরিধি হৃদয়ঙ্গম করা তাই বোধ হয় তবু একটু সহজ। এবং এই নিয়ম সংযম ও শ্রমমাহাত্ম্য শারীরিক অর্থেও বিস্ময়কর, প্রায় পৌরাণিক যোগীজনোচিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগশয্যার প্রান্তিক থেকে পুনর্জীবিত তিনি একটি কেঠো চেয়ারে বসে গল্প করেছেন, সাহিত্য-সাহিত্যিক বিষয়ে পদ্য ও গদ্যছন্দ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, গানের পরে গানের কলি গেয়ে শুনিয়েছেন। এবং একটি ছবি আঁকা শুরু থেকে শেষ করেছেন : দেখ তো আমি কিরকম ছবি আঁকি। মনে আছে, রং ফুরিয়ে গেল, গৃহস্থের চামড়ার কাজের রং দিয়েই আঁকা শেষ করলেন! এবং তাঁর রেশমী চাদর ঢাকা নরম কিন্তু সরু বিছানায় বিড়ম্বিতভাবে বসে বসে,—কারণ অধমাঙ্গ বিষয়ে সচেতন,—এক নবযুবক ভেবেছে কি করে তিনি

আয়ত্ত করলেন একাসনে চারঘণ্টা একভাবে বসে থাকার ভারতীয় ঐতিহ্যের যোগীজনোচিত ঐ শক্তির অভ্যাস। . . .

অথবা, মনে পড়ে আরো আগের শান্তিনিকেতনের এই দৃশ্য :

তখনও কি নিচু বারান্দায়
রোদ্দুরের আলিম্পনা? নাকি শুধু ছায়ার অধ্যাস?
হালকা কুরশিতে তাঁর অক্লান্ত আসন,
লিখে যান অপরিসর টেবিলে,
খোয়াই-এর প্রখর হাওয়ায়।

কি লিখছেন? উপন্যাস?
একালের গোরার বিকাশ?
কিংবা কোনো দামিনীর নতুন বিন্যাস?
অথবা অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ? বা চৈতন্য লাইব্রেরী বা রামমোহন
বা অ্যালফ্রেড থিয়েটারে সমস্যার সমাধানে দীর্ঘ পাঠে
ঘর্মাক্ত সে দিব্যকান্তি, গেন্‌জিহীন গরদ পানজাবি—
তারই লেখা? বা ভাষণ?
কিংবা কোনো দীর্ঘায়ু কবিতা? ছন্দে মিলে
নিরবচ্ছিন্ন বুননে মনে মনে বাকৈশ্বর্যে কালের রাখাল
ভগ্নকণ্ঠ উচ্চস্বর নাটকীয় আবৃত্তির লয়ে লয়ে?

দাঁড়ান। খোদাই মূর্তি। কলমের সে প্রচণ্ডগতি অবসান
পদক্ষেপ কয়বার। অন্যমনে, দুইকোণে মিত বারান্দায়?
দূরদেশী চোখের তন্ময় রাখালের অন্বেষায়
মনে হয় অবচেতনের মুখে ফুটে আসে সুর, ভাসে কথা।
গান আসে, গান ওড়ে, শব্দ সুর ওঠে পড়ে,
কাঁপে স্তব্ধ পড়ন্ত হাওয়ায়।

তারপরে আবার হঠাৎ টেবিলে বিজয়ী হাত
রাখেন এবং ঐ কলমের দক্ষিণে হাওয়ায় সর্বত্র, সর্বথা
ওড়ে কথা ওড়ে সুর,
কাছে দূরে, অন্ধ বন্ধ করেই না পাখা।
বারান্দায় সূর্যগুলি নেমে বসে নতজানু
ছায়াগুলি করে প্রণিপাত,
ভূলুণ্ঠিত রবিচ্ছায়া নিথর হাওয়ায়।

ছবি দেখা বাধ্যতই ক্ষান্তি পায়।
বাগানের গাছের ছায়ায় স্থাণু
যুবক—বা বালকটিই—নিবিড় চৈতন্য আঁকড়ে ফিরে যায়
আসন্ন সন্ধ্যায়,

টাটাহোসে চাখানায়, নাকি বোলপুরের ইস্টিশনে বিরিক্ত
চত্বরে॥

দুই.

অন্তত নিছক বয়সের গুণে তাই আমরা স্বভাবতই ভাবতে পারি যে আমরা বৃহত্তর রাবীন্দ্রিক বাংলার, সুতরাং ভারতবর্ষেরও, লোক। আমরা একটু আশ্চর্য হই বৈকি যখন শুনি আমাদের তরুণ বন্ধুবান্ধব অনেকেই এ জগতে নিজেদের বহিরাগত মনে করেন। তাই কি তাঁরা দেশকে, বাংলা-সাহিত্যকে দুশো বছর, পাঁচশো বছরের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন, যেমন ভেবেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান বিশ বাইশ বছর আগে? এবং তাদের নিজ নিজ দশক নামক এক কাল্পনিক ইংরেজি মার্কা ঐতিহাসিক সংখ্যায় নিজেদের বৈশিষ্ট্যসন্ধান খণ্ডিত করেন? এবং ঐতিহ্যকে পুনস্সৃষ্টি এবং প্রসারিত করতে চান না পদে পদে নবার্জিত ব্যক্তি-স্বরূপের চেষ্টায় চেষ্টায়? অথচ ঐতিহ্যের ভূমি ঝাড়া ঐতিহ্যকে তথা রাবীন্দ্রিক সীমাকে অর্থাৎ নিজেকে রূপান্তরিত করা যায় না এবং রূপান্তরিত করতে না পারলে রচনার রূপায়ণে স্বকীয় শক্তিবিকাশের উপায় নেই।

অবশ্য স্বদেশীযুগ থেকে, এবং তার আগে থেকেই, রবীন্দ্রনাথের অকাল-

মৃত্যু অবধি অকালেই বটে, আর তারপরে ক বছর ধরে বাংলার বৃহৎ ও তীব্র অভিজ্ঞতার হয়তো ব্যক্তিগত উপলব্ধি তাঁদের বয়সে সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্যক্তিগত না হলেও নিজেদের চৈতন্যকে জাতীয় অতীত ও বর্তমানে সঞ্জীবিত করার অভিজ্ঞতা তো বাংলা লেখক শিল্পীদের তথা ব্যাপকভাবে দেশবাসীর থাকা আবশ্যক। এর সঙ্গে আগেকার অন্ধ রাবীন্দ্রিকতার কোনো মিল নেই, সুতরাং স্বকীয়তার অহঙ্কারে আটকানো উচিত নয়।

কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনকর্মের কালের অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড বাস্তবতা ব্যক্তিগত স্মৃতিতে না থাকলেও, সেই সশরীর উপস্থিতির মাহাত্ম্য বিচলিত না করে থাকলেও, সে অভিজ্ঞতা ও তার পুরুষার্থ বাংলাদেশের জল হাওয়াতে আজও সত্য।

তাই তো ১৯৬১-তে আটাশি বছরের সরল মানুষ মার্কিন মহাকবি রবর্ট ফ্রস্ট বলেছিলেন :

আমার জীবনে আমি পেয়েছি দুতিন জন জাতির রচয়িতা বা উজ্জীবন-কারীর মহাবন্ধুত্ব লাভের সুযোগ। মেলামেশার ফলে আমিও হয়ে উঠেছি, রাষ্ট্রবেত্তা। আজকাল আমার স্বদেশে আমিও হয়ে উঠেছি রাষ্ট্রবিদ, দেশমনীষী, যার জন্যে আমার কিছু বন্ধুবান্ধব, রাজনীতি শব্দটাই যাঁদের অপছন্দ, আমার বিষয়ে দুশ্চিন্তিত। যাক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আয়ার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে আমার মনের যোগাযোগ আছে, আয়র্ল্যাণ্ডকে যে সব কবি গড়ে তুললেন তাঁরা ছিলেন আমার সুহৃদ। তাঁদের আমি ভালোরকম জানতুম। আর সবচেয়ে ভালো জানতুম এক ভারতীয়কে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শুনে ভালো লাগল যে আজও তিনি ভারতবর্ষে এক জীবন্ত শক্তি, এ খবরটা আমাকে খুব নাড়া দেয়। আমি জানতুম যে যা আগে ঘটেছিল, ঘটছিল সে সব কিছুর মধ্যে তাঁর নেতৃশক্তি জাগ্রত ছিল। এবং তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট দেখাশোনা হয়েছিল, সেই পরিচয়ে আমি বুঝতে পারি কি করে তা ঘটেছিল—তাঁর বিচিত্র ব্যাপ্ত সম্প্রীতি, তাঁর মৈত্রী, স্বদেশে তাঁর বহুবিধ কর্মের বিস্তৃত জীবন।

ফ্রস্ট আরো বলেন : এখন এ ব্যাপারটা আমার কাছে আরো মনোজ্ঞ লাগে, ঠাকুরের ব্যাপারটা, তাঁর সত্তার স্বরূপ দেখতে পাওয়া। তিনি দুইই ছিলেন, এ কথাটা আমি বলব, প্রথমত তাঁকে গ্রহণ করতে হয় এক বিরাট দেশপ্রাজ্ঞভাবে, রাষ্ট্রবেত্তাভাবে এবং তাঁকে আমরা ভাবব এমন এক মানুষ

বলে, যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন একজন আর্টেঃই-জন্য-আর্টিস্টরূপে। এটা করতে তিনি ভয় পান নি—।

ফ্রস্টের কথা বলার রীতি যতই অপ্রত্যাশিত হোক, আপন প্রতিভার খেয়ালে মশগুল হোক, তাঁর কথাটা এখনও আমাদের ভাববার মতো, বিশেষ করে আমাদের সংস্কৃতি-জগতের মার্কিন-ইঙ্গ লবির মধ্যে। এবং কি ইঙ্গ-মার্কিনী কি মার্কসীয় আমাদেরই পক্ষে ভাবাটা আশু ফলপ্রসূ হতে পারে। আমরাই একটু শ্রমস্বীকার করলে উপলব্ধি করতে পারব "কবিকাহিনী"-র আশ্চর্য বালক নিবিষ্ট কিন্তু স্বাভাবিক মননে ক্রমান্বয়ে নিজের ঐ উভয়ত অখণ্ড বিকাশে গভীরতা ও প্রসার অর্জন করেছেন, বাস্তব জীবনের সবদিকের সমস্যায় সংকটে লগ্ন হয়ে বিরাট রাষ্ট্রবিদের মতোই সমাধানের পথ ভেবে ভেবে, আবার ক্রমান্বয়ে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে জীবনসংলগ্ন অভিজ্ঞতার ধাক্কাকে রূপান্বিত ক'রে বিজেতা শিল্পকীর্তিতে। ক্রমান্বয়েই, কোনো সিদ্ধি সাফল্যে আবদ্ধ না থেকে সমাজে উত্তরণ ও বিকাশ-ব্যাপ্তির মধ্যে দিয়ে ক্রান্তিপরম্পরায়, মৃত্যুকাল অবধি।

সেই প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের, ভারতবর্ষের স্পষ্ট-অস্পষ্ট ঐতিহ্যকে নিজের বিশিষ্ট সত্তায় স্বরূপ সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ বর্জন রূপান্তরের অক্লান্ত সম্বন্ধ-সাধনায় তিনি কিভাবে রচনা করে গেছেন আমাদের উত্তরাধিকারের বিরাট ক্ষেত্র এবং তার অনিবার্য সীমাও—সে চর্চায় আমাদেরও জাগ্রত মনন শ্রম-সাপেক্ষ ও অর্জিতব্য।

নিশ্চয়ই চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বা সত্তর দশকে বাসিন্দাদেরও। সাংস্কৃতিক কর্মী মাত্রেরই পক্ষে এই উপলব্ধি শ্রমসাপেক্ষ, জন্মকালের হ্যাণ্ডিক্যাপ এ ক্ষেত্রে কেউই পান নি। কিন্তু শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক নয়, মানবিক নয়, নিছক সাংস্কৃতিক স্বাধীনতালাভের গরজেই, শিল্প সাহিত্য রচনাতেই জীবন্ময়তা অর্জনের জন্যই এ বিষয়ে সচেতনতা কি আবশ্যিক নয়? অবশ্য বয়সোচিত স্বভাবে প্রতিবাদ-প্রবণতাতে মনে হতে পারে যে রবীন্দ্রকীর্তিকে নস্যাৎ করলেই স্বনামস্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। বর্নার্ড শ যেমন শেক্সপিঅরকে অন্ধ পূজারবিরোধী স্বাভাবিক কারণেই বুঝতে না চেয়ে হাস্যরসিক শ বনাম শেক্সপিঅর লড়ায়ে নামেন, যদিচ শেক্সপিঅরের রচনাবলীর কাব্যমূর্তি সেই তীরন্দাজের অঙ্গনের চৌহদ্দিতে ছিল না। তেমনি শ-র রচনাবলী পাঠে বোঝা যায় কেন,—একমাত্র "ক্যাণ্ডিডা" এবং হয়তো "সেণ্ট জোন" ছাড়া তাঁর কোনো

নাটকেই নাট্যের কাব্যপ্রাণ নেই। বস্তুত তখনকার ইংরেজি নাট্যাবক্ষয়ের প্রতিবাদেই হয়তো এই শেভিআন আতিশয্য ঘটেছিল, যেমন শ-আর্চরের ইবসেনবাদ এখন বোঝা যায় কেন ইবসেনের ট্রাজিককাব্য-মাহাত্ম্য অবহেলা করেছিল, বাধ্যতই।

কম বয়সে দেখেছি, আমাদের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধুরা কেউ কেউ, হয়তো বা তখনকার মামুলি গড্ডল গয়ংগচ্ছ রাবীন্দ্রিকপণার প্রতিক্রিয়ায় এইরকম প্রতিবাদ বা অস্বীকারে মেতেছিলেন এবং নিজেদের মনোলোকের রবীন্দ্র-প্রতিমা নিজেরাই শূন্যে ভাঙতে গিয়েছিলেন ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসকে বা যতীন্দ্রনাথকে টেনে এনে, তাঁদেরই প্রতি অন্যায় ক'রে। তারুণ্যের স্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসচাপল্যে নিশ্চয়ই ব্যাপারটার উৎস—যেমন তরুণ কিশোর দাড়ি-গোঁফ অর্জনের সাধনায় ক্ষৌরকার্য শুরু করে বিনা প্রয়োজনে নিজগণ্ডে রক্তারক্তি সয়ে, যার জন্যে বয়স হলে ক্ষোভ অনিবার্য, বিশেষত ব্লেড আমদানি সংকোচ-নীতি চালু হওয়ার পর থেকে! কারণ অবিলম্বে বিদ্রোহীরা উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রবিলাসী হয়ে গেলেন রবীন্দ্র প্রতিভার কৌতুকরঙ্গ "শেষের কবিতা" প্রকাশের পরে। লক্ষ্য করার বিষয়, "গোরা", "চতুরঙ্গ", এমন কি "ঘরে বাইরে" পাঠের ফলে নয়।

এরকম বর্জন গ্রহণের পেণ্ডুলামবেগে না দুলে জেরার্ড হপকিনসের মতো স্বকীয়তায় ঐতিহ্যপরিপাক কি আরো সার্থক ও সৎ নয়? হপকিনস্ তাঁর মামুলিকাব্য-বাদী বন্ধুকে ব্রিজেসকে তাই লিখেছিলেন যে তিনি মিল্টন ভক্ত কিছু কম নয় ব্রিজেসদের চেয়ে, কিন্তু তাঁর ভক্তি ও উপভোগ যাথার্থ্য পায় মিল-টনের স্বয়মসার্থক আলংকারিক কৃত্রিমতায় ভাবি ভাষা ও ছন্দরীতিতে লেখার চেষ্টায় নয়, ভিন্নতায়, কবি হিসাবে ভিন্ন স্বধর্মসাধনায়। তিনি একথা বলেছিলেন, তাঁরই ভাষায় স্মর্টিংলি—হ্রেষাস্বরে।

মনে আছে আমাদের তরুণ প্রতিভাধর বন্ধু শ্রীমান সমর সেন যখন যৌবনে আবিষ্কার করলেন যে তাঁর রামায়ণ মহাভারত পড়া হয় নি এবং না পড়লে মানসে ফাঁক থেকে যায়, তখন সেই অসম্পূর্ণতা তিনি দূর করলেন শ্রমস্বীকারে, বিরাট মহাভারতও তিনি আদ্যন্ত পড়ে ফেলেছিলেন।

সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী পাঠও তাই আমাদের নিজের গরজেই আবশ্যিক। আমাদের সংস্কৃতি চর্চায়, আমাদের জীবনযাত্রাতেও।

তিন.

ব্যাপারটা নেহাত ভাববিলাসিতা নয়। বাংলাদেশের লোক আমরা, নির্বিশেষে আমাদের সকলের কাছেই রবীন্দ্রকীর্তি হয়েছে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নিজেদেরই সত্তার সন্ধানে গভীর সত্য। সে প্রচণ্ড গতি অবসান, কিন্তু আজও তাই রবীন্দ্রচর্চা আমাদের সকলের কাছেই কমবেশি আবশ্যিক এক বাস্তব প্রয়োজন।

এবং বেশ আশার কথা কয়েকজন সুধী ব্যক্তি এই চর্চায় পাঠকসমাজের সহায়, আর পাঠকসমাজ বলতে বোঝায় বর্তমান বা আগামী বাংলাভাষী আমরা সকলেই। আমাদের বারবার মনে রাখতে হয় যে তিনি বহুবিচিত্র প্রতিভায় পাওয়া বিরাট মানুষ, স্রষ্টা ও কর্মী। তাঁর কীর্তি শুধু কবিতায় গল্পের উপন্যাসের নাটকের প্রবন্ধের পর্যাপ্তিতেও নিঃশেষ হয় না। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের মনে সবকটি সুকুমার বৃত্তিকে জাগ্রত ক'রে রাখে। তাছাড়া তো রয়েছে তাঁর চিত্ররাশি, আছে জীবনের সর্ববিধ অবস্থার উপযোগী চিন্তার ও কর্মের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব, শিক্ষায়, জাতীয় জীবনের সর্ববিধ সংগঠনে, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও দায়িত্বের দীক্ষায়—কিসে নয়? প্রতিভাধর আরো কেউ কেউ থাকলেও এই অন্তরঙ্গ ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় গোটা দেশে নিত্য প্রভাবের এবং বহুবিধ সংবেদনের দিক থেকে কেউ রবীন্দ্রনাথের তুল্য নয়। রবীন্দ্রনাথই একমাত্র জীবনের ও শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জীবনের কর্মী যিনি আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত বিকলাঙ্গ মানস জগতে সুস্থ আধুনিক মননেরও সভ্য-মানবতার বিস্তৃত উৎসপ্রতীক, যেন এক অবারিত বিশাল হ্রদ।

কিন্তু তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনোলোক প্রকাশ্য করায় নিজের একটা বাধা ও শালীনতার সীমা থাকায়, সে দায় আমাদেরই চেষ্টার দায়িত্বে বর্তেছে, আমাদেরই চেষ্টা করতে হবে সেই মনের বাস্তব জগত শ্রমে সন্ধানে চিন্তায় বিস্তৃতভাবে অন্তরঙ্গভাবে বোঝার জন্য হ্রদের গঙ্গা নামাবার জন্য। অন্তত তাই হওয়া উচিত, আমাদের নিজেদের গরজেই, মানুষ হিসাবে, পাঠক-শ্রোতাদর্শক হিসাবে, চৈতন্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে, বিশেষত এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ তাঁর উত্তরাধিকার—মহত্ত্ব ও তাঁর বৈশিষ্ট্য বা স্বাভাবিক সীমা নির্দেশ আমরা এখনও যথোচিতভাবে মনেপ্রাণে জীবনে ব্যবহার করতে পারি নি। এবং বিশেষভাবেই শিল্প-সাহিত্য কর্মীদের পক্ষে সাধনাসিদ্ধির বিচারে আমাদের পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে।

সেই জন্য অজিতকুমার চক্রবর্তীর সময় থেকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন মশায়দের রবীন্দ্রচর্চা অবধি সব কিছুই আমাদের এত উপকারে আসে। কিন্তু এখনও জ্ঞাতব্য বাকি আছে অনেক কিছু। যেহেতু রবীন্দ্রজীবন তাঁর দীর্ঘ শিল্পসাহিত্যকর্ম-জীবনও বটে এবং কম-বেশি নানাভাবে প্রত্যক্ষে বাংলার সামগ্রিক জীবনেও জড়িত, তাই সেই পূর্ণাঙ্গ জীবনের ছোটোখাটো ঘটনাও আমাদের জিজ্ঞাসা জাগায়। যেমন ধরুন, যে বিদ্যাসাগরের কথা রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার এবং বিস্তৃত মনোযোগে ও সাফল্যে পরম শ্রদ্ধায় লিখেছেন, সেই বিদ্যাসাগর মশায়ের সেকালের দুর্গম কর্মাটাঁড়ের নিভৃত বাড়িতে গিয়ে—সে বাড়ি কি মাটির বাড়ি ছিল?—রবীন্দ্রনাথ যে কদিন ছিলেন—কতদিন ছিলেন, দশদিন?—তখন তাঁদের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কোন সব বিষয়ে?

কিংবা ধরুন, স্বদেশী যুগের গোড়ায় সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ডন সোসাইটি ও ডন পত্রিকার জাতীয়তাবোধের আবহাওয়ায় মানুষ ছাত্রদের মধ্যে কবি কি ভাবতেন? কিছু যে ভাবতেন তার প্রমাণ তিনি শিবনারায়ণ দাসের গলিতে মাঝে মাঝে যেতেন, এমন কি শুধুমাত্র চাদর গায়ে দিয়ে, এবং এক-আধদিন কিশোরযুবাদের সঙ্গে পিঁড়ি-পাতা খাবার-ঘরে খেতেও বসে যেতেন। কেন তিনি পরে একসময়ে সতীশবাবুকে এবং তৎ-শিষ্য রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে আমন্ত্রণ করেন সেকালের স্বল্পকায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে? এবং দুদিন পরে শিক্ষকদের সঙ্গে এক সান্ধ্যবৈঠক ডাকেন—বলুন, সতীশবাবু, আমাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রম তো দু-দিন দেখলেন, কি আপনার মত?

সতীশবাবু যখন বললেন, খুবই ভালো, বেশ ভেবেচিন্তে সব ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমার শুধু মনে হচ্ছে যে ওআর্ডসওআর্থের মতো কোনো বালক যদি এখানে থাকত, সে কি পালিয়ে যেত না? কারণ ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে দেখলুম শিক্ষক মশায়রা খেলা ও প্রকৃতিকেও ভালোবাসা শেখান। রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠে বললেন. নাও অজিত, সতীশবাবুর কথায় কি বলবে? আচ্ছা সতীশবাবু, আমার একটু কাজ আছে. আমি যাব? আপনারা কি একটু আলোচনা করবেন?

(এরপরে আর তিনি সতীশবাবুকে বলেন নি, সতীশবাবু রবিকে (ঘোষকে) আমাদের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিক্ষিত হতে বলুন।)

আর এসব প্রশ্ন ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের বিষয় অলস প্রশ্ন মাত্র নয়, কারণ মুখ্য-

গৌণ সব কিছু জ্ঞাতব্যেই রবীন্দ্রজীবনী বা আলেখ্য ঐশ্বর্য পায়,—এ রকম বিস্তৃতি ও সংলগ্নতা বা সংহতি কোন্ একটি ব্যক্তিস্বরূপ পেয়েছে কোন্ দেশে কোন্ যুগে ?

তাই তো এত মৌলিক ও গৌণ জিজ্ঞাসা। উদাহরণত তাঁর গানের দীর্ঘ ইতিহাসে যাঁদের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ স্থান আছে, সেই সব ওস্তাদদের ও গায়ক গায়িকাদের বিষয়েই বা আলোক পাব না কেন ? এখনও কেন সাহানা দেবী, সাবিত্রী দেবী প্রমুখ প্রবীণ শিল্পীদের ডেকে বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, আকাশবাণী সর্বজনকে জানাতে বলেন না ? কারণ জানলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌন্দর্যে স্বয়ন্তর আবেদন ও সাঙ্গীতিক ব্যঞ্জনার পটভূমি ও স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আরো সার্থক হত। অবশ্য পত্রাবলী পুস্তিকাগুলি এ সব বিষয়ে কম সাহায্য করে না, যেমন অন্যান্য অনেক বিষয়েও করে। মালতীপুঁথি আলোচনাও পড়তে পাওয়া যায়, কিন্তু আরো কত কিছু প্রকাশের অপেক্ষায় পড়ে আছে। 'পারিবারিক খাতা'-র আলোকই বা সাধারণ পাঠক কেন পাব না ? রবীন্দ্র-বিশারদ পুলিনবাবু তো শান্তিনিকেতনেই যুক্ত; ক্ষিতীশ রায়-ও তো কম জানেন না, তিনিও আমাদের সাহায্য করুন না কেন।

কিছু কিছু সংগ্রহ অবশ্য সম্পাদিত হয়ে বেরিয়েছে, সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, কিংবা পল্লীপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভাবনা। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পল্লার মানুষ রবীন্দ্রনাথ-এর স্মৃতিকথা আমাদের জ্ঞানের অনেক কিছুকে শারীরিকতা দেয় বৈকি।

অথবা ধরুন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবানুবাদসহ ইংরেজ কবির, যথা শেলির কবিতার আলোচনা "ভারতী"-তে ছাপতেন, সেগুলি কেন পুনর্মুদ্রণ হয় না ? অথবা ব্রাউনিঙের কাব্যগ্রন্থ কিভাবে তিনি পড়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে পাশে পাশে অনুবাদ লিখে লিখে, সে বিষয়ে কি আমরা সাহায্য পাব না ? (কবিই একদিন বলেছিলেন, চিত্ত অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই কপিটি পডতে নেন এবং বইটি আর ফেরত আসে নি—"জানো তো বাংলা দেশে ছাতা আর বই বডই নশ্বর বস্তু।") অনেকেই বিশেষ করে জানতে চায়, যে মহাকবির প্রকৃতিপ্রেম ও প্রকৃতিমানবের আর শিশু সম্বন্ধে চিন্তা ইউরোপে হয়তো বিস্ময়কর কিন্তু রাবীন্দ্রিক ভারতীয় জগতে প্রায় স্বাভাবিক, সেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেন ? উভয়ের কাব্যেই তো জগত পারাবারের তীরে ছেলেরা করে মেলা : And see the children

sport upon the shore, And hear the mighty waters rolling evermore.

আর রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী পড়ানো? সিংহলী ও ব্রহ্মদেশীয় বালক দুটি সহ (বালক অপূর্বকুমার চন্দকে) কীটসের ওডস পড়ানো? আর্নলডের সোরাব ও রুস্তম কবিতাটির তাঁর স্বহস্ত লিখিত ব্যাখ্যার প্রস্তুতির কিছু অংশ বোধহয় রবীন্দ্রসদনে এখনও আছে এবং কলকাতাবাসী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত মশায়ের সহধর্মিণী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীযুক্তা গুপ্তের সযত্ন রক্ষিত অংশটুকু দেখতে পেয়ে লাভবান হয়েছিলুম, কিভাবে অনিংরেজ বালকদের ইংরেজি শেখানো ও ইংরেজি কাব্যাস্বাদ দেওয়া উচিত।

সাধারণ কিংবদন্তীর ফলে অনেকের ধারণা যে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলা হয় প্রেরণা, সেই প্রায়াচেতন জাদুকরী তাড়নায় কবিতাদি রচনা করতেন। এই অসতর্ক ধারণা যেমন আংশিক সত্য, তেমনি তিনি কী পরিশ্রমী মনোযোগে অন্যান্য কাজের মতো কবিতা বা গানও পুনর্লিখন করতেন সেই অন্তর্তাড়িত রচনারই শিল্প রূপমর্যাদায়, তা আমরা বন্ধুবর পুলিনবাবু মতো রবীন্দ্রচর্চায় একনিষ্ঠ গবেষকের সাহায্যে উত্তরোত্তর পূর্ণতরভাবে জানতে পারছি আমাদেরই উপকারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে শুনেছিলুম তাঁদের প্রথম বয়সের কবিতাও নিবিষ্ট মনোযোগে প্রকাশার্থে পাঠ করে দিতেন।

মনে পড়ছে শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের মুখে বছর পঁয়ত্রিশ আগে প্রথম শুনেছিলুম 'লিপিকা'-প্রসঙ্গে কথাবার্তায়, যে 'লিপিকা'র কাব্যগন্ধের ছন্দের যে অনিবার্য নিশ্চয়তা, সে নিশ্চিতির সৌন্দর্যও নানা পরিবর্তন পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে কবির স্বোপার্জিত জয়লাভ, দৈবশক্তির আকস্মিক প্রেরণায় পাওয়া নয়। মহলানবিশ মশায় বৈজ্ঞানিক, তিনি ঐ ভিন্ন ভিন্ন পাঠপাঠান্তর তারিখ দিয়ে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। আশা করি তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি অচিরে প্রকাশ করে রবীন্দ্রচর্চার একটি বিশিষ্ট দিক আলোকিত করবেন। ইতিমধ্যেই মহলানবিশ দম্পতি আমাদের প্রচুর সাহায্য তো করেছেন রবীন্দ্র বিষয়ে নানা লেখায়।

প্রসঙ্গত, মনে পড়ছে, পুলিনবাবু যে টালিসংস্করণ কাব্যগ্রন্থটি পটলডাঙার পেভ্‌মেণ্ট থেকে একটাকায় কেনেন, সেটি যখন তিনি অন্তরঙ্গ মৈত্রীতে বিজয়ী পুলকে দেখান, তখন এই পাঠকের হৃদয়—কিঞ্চিৎ ঈর্ষাসত্ত্বেও, কাব্যিক আগ্রহেই চঞ্চল হয়। কারণ কপিটি কবির নিজের, বহু পৃষ্ঠায় বহু অংশ কেটে

বাদ দেওয়া এবং পাশে পাশে পাঠান্তর স্বহস্তে লেখা। পাঠকের কাছে এরকম পাঠপাঠান্তরে পুনর্লিখন পড়ায় রবীন্দ্র-কাব্যচর্চার নন্দনময়তার রহস্য গভীরতাই পায়।

এই বিরাট সৃষ্টিময়তা, নিরলস শিল্পীর এই রূপের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তিই ক্রমান্বয়ে দাবি করে বিনীত মনোযোগের, নিরলস শ্রদ্ধার এবং সংবেদনশীল গবেষকের পরিশ্রম। এবং পরিশ্রম করবার সুযোগ সুবিধাও। আর তারপরে আমাদের পক্ষে এই সবের সামগ্রিক একটা সচেতনতা।

অবশ্য নির্বোধ তুলনায়—কিবা অজ্ঞ কিবা পণ্ডিতী—বিভ্রান্তিই বেড়ে ওঠে কিন্তু শেকসপিঅর চর্চায়—যা বিশ্বব্যাপী এবং যার ফলে লেখা শুধুমাত্র বাছাই করা বইপত্রই কয়েকটা আলমারি ভরে দেবে, তাতে মাছিমারা মনের অপকার হলেও জাগ্রত বুদ্ধি গভীরতর ঐশ্বর্যই পায়। এবং অন্তত আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত নয় যে একটা গোটা দেশের জীবনের এবং মানসের সত্তানির্ণয়ে রবীন্দ্র-কীর্তির বিস্তারের তুলনা দান্তের ইতালিতে নেই, যেমন নেই শেকসপিঅরের ইংলণ্ডে। রবীন্দ্রচর্চা ব্যাপ্তিতে এক বিশ্বমানবের স্বদেশে ও বিশ্বে একযোগে প্রয়োজনীয় পরিক্রমাই বটে—বিশেষ করে যখন আমাদের বিশ্বই বিমূঢ়, বেদনার্ত, মর্মে মর্মে উদ্‌ভ্রান্ত, উদ্বায়ু।

পূর্ববাংলায় কবি মধুসূদন

হত্যাকাণ্ডে ক্ষতবিক্ষত পূর্ববাংলা থেকে আগত সহমর্মী কয়েকমাস আগে একদিন বললেন, গতবছর মাইকেলউৎসব পালিত হয় যশোহরের কবতক্ষ-তীরে সাগরদাঁড়িতে এবং বহু দর্শকশ্রোতার মধ্যে ছিলেন অনেক বিনীত কৃষিজীবী মানুষ, যারা হয়তো উচ্চশিক্ষা পাবার সৌভাগ্য এখনও অর্জন করেননি। তারপরে—যশোহরে অস্তে গেলা দিনমণি।

অবশ্য গত কয়েকবছর ধরে, মাতৃভাষার অবিচ্ছিন্নতার বিচারে যতই অযৌক্তিক হোক না কেন, ঢাকা আর কলকাতার মধ্যে বাংলা বই-এর যাওয়া-আসা সহজে ঘটেনি। তাই মধ্যে খুশি লেগেছিল ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম-লিখিত 'বাংলার কবি মধুসূদন' পড়বার আকস্মিক সুযোগ পেয়ে। লেখিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, শুনেছি তিনি জীবিতই আছেন। তিনি শুধু পাণ্ডিত্যজীবীদের জন্যই বইটি লেখেন নি, তিনি প্রথম অধ্যায়ে পরিষ্কার একটি আলোচনা করেছেন মধুসূদনের কাব্যপাঠের ভূমিকা নির্ণয়ে। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সঙ্গত আলোচনা করেছেন কিভাবে মধুসূদন নিজেই একাধারে একটি যুগের সৃষ্টি এবং যুগস্রষ্টাও বটে। তারপরে নীলিমা দেবী যথাক্রমে দেখিয়েছেন মধুসূদনের কাব্যবিকাশ—'তিলোত্তমাসম্ভব' থেকে " 'বীরাঙ্গনা' অবধি, তিনি ঠিকই বলেছেন যে 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদনের শেষ কীর্তি এবং কাব্যসম্পদে শ্রেষ্ঠ কীর্তিও।"

বইটির দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হয়েছে চতুর্দশপদী অধ্যায়ের পরে নাট্যকার মাইকেলের বিশদ বিচারে এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র মূল্য নিরূপণে লেখিকা পাঠকের সমর্থনই পাবেন। বাস্তবিকপক্ষে, প্রহসনদুটির মধ্যে দিয়েই মধুসূদনের সাহিত্যকীর্তির মহত্ত্ব ও সীমাবদ্ধতার স্বরূপ অমনোযোগী বা কবিতায় স্বল্পোৎসাহ পাঠকের কাছেও খানিকটা স্পষ্টতা পেতে পারে। কি করে যে ইওরোপমাতাল যশোরের ছেলে এই শক্তিধর কবি বাংলা পদ্যের মর্মস্থল অন্বেষার অধিকার পেয়েছিলেন, সেই কাব্যিক বা সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা যদি কারো মনে নাও থাকে, আমাদের ইংরেজি যুগের সামাজিক ইতিহাসের

প্রশ্নের গরজেই জানতে হয় মধুসূদনের এই দ্বন্দ্বময় রহস্য, এবং প্রতিভা বলে এই দ্বন্দ্বকে জীবনের হলাহলে মন্থিত করে সাহিত্যসৃষ্টির রসায়নের মধ্যে দিয়ে উত্তরণের মহত্তর রহস্যও।

রবীন্দ্রনাথের মতো মধুসূদন হয়তো ঠিক একটা আদর্শ পারিবারিক শিক্ষা পান নি, তবে তাঁর মায়ের কল্যাণে বাংলার দেশজ কাব্যজগতে তিনি শৈশবেই আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেকালের বহু নব্য-শিক্ষিত বাবুদের মতো মধুসূদনও বাংলাদেশে ইংলণ্ডের উপমার পিছনে ধাওয়া করেছিলেন, এবং তাঁর এই অসাধ্য-সাধনার আরম্ভ বালক-বয়স থেকেই। তবু রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ভাষার গভীরতা যশোর—খিদিরপুর—বিলাতের ছেলের রক্তের মধ্যে অমর হয়ে ছিল। বস্তুত মধুসূদনের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয় এই দেশজ ও বিদেশীর দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই, কারণ চৈতন্যের এই ভঙ্গ-ঐক্যের বিবর্তন সারা ইঙ্গ-ভারতীয় যুগের ভিত্তিতে নিহিত, সামাজিক রাজনৈতিক মানসিক সব অর্থেই।

অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসী অনেকের চেয়ে মধুসূদনের অভিযান ছিল অনেক বেশি নাটকীয় অনেক বেশি একাগ্র, অনেক দুঃসাহসী উড়নচণ্ডী পরিশ্রম ছিল তাঁর ইওরোপ আবিষ্কারে। ইংরেজি, লাতিন, ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, গ্রীক, সংস্কৃত, ফারসি—নানা ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁর উৎসাহ ছিল গভীর। কিন্তু বাংলার ফল্গুর স্নায়ুপ্রভাব এ সবের তলায় তলায় চলে এবং মাদ্রাজ-ফেরতা এই আজব ইঙ্গ-বঙ্গীয় যুবককে দিয়ে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক লেখায় বাংলাতেই এবং তাঁর প্রথম পঠনীয় কাব্যও তাঁকে ঐ প্রভাবের বশে লিখতে হয় মাতৃভাষাতেই।

আজকের আত্মপ্রসাদে মনে হতে পারে গোটা ব্যাপারটাই ছিল অস্বাভাবিক, কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটেছিল একটি সমগ্র দেশের উপরে ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন ঘোর অস্বাভাবিক এক শোষণ-শাসনের জগদ্দল চাপের ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায়। বরং মধুসূদনের ইংরেজি ব্রতপালনের মধ্যে একটা চরম নৈয়ায়িক নিষ্ঠা দেখা যায়। আমাদের নবজাগরণের পুরোধাদের অধিকাংশই সদরে শ্বেত দ্বীপের কাছে আত্মা বিকিয়ে ছিলেন কিন্তু অন্দরে দেশী অভ্যাসে গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের নিরাপদ ঝঞ্ঝাটহীন পুণ্যের মায়া ছাড়েন নি। পূর্বসূরি মনীষীদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম বেশি ছিল না; এক বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর মূলত নিঃসঙ্গ অন্তরাত্মার সংহতিকে কোনো সস্তা

লোভে বা সান্ত্বনায় আহত হতে দেন নি, তিনিই সজ্ঞানে ইওরোপকে দেখেছিলেন, এবং ইওরোপের মানবিকতার দিকটাই যথোচিতভাবে আকৃষ্ট করেছিল এই পণ্ডিতমহাশয়কে, যেমন পরে করেছিল তাঁর প্রতিভাদীপ্ত উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথকে। সেই ভিক্টোটিরীয়স্ (!) বুর্জোয়া যুগের ইংরেজের দুর্দান্ত কিন্তু তখনই নিম্নগামী জয়যাত্রার জৌলশে এঁরা ভোলেন নি, যদিও এই ভোলার সমর্থন আমাদের বিড়ম্বিত ইতিহাসেই ওতপ্রোত ছিল।

এখনও আছে। যদিও ইওরোপে অর্থাৎ ইঙ্গমার্কিন ফরাসি ইত্যাদি সমাজে পশ্চিমা সভ্যতার তেজ আর উঠতি নয়, মরিয়া অস্তিসর্বস্ব মোদকে মদিরায় বা শুভবুদ্ধি বিরোধীর প্রসাধনে। কিন্তু ঐ পশ্চিমের উপমাই আজও আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে,—পূর্ব ইওরোপের নবজীবনের প্রাণস্পন্দন নয়। তাই আমরা যখন অতীতের শিক্ষা নিতে চাই তখন মধুসূদনকে সংগ্রামীর প্রাপ্য মনোযোগ দিই না, দিই বিদেশী মহাজনদের, প্রকৃতই যাঁরা মহাজন, ট্রাজিক মহিমায় স্মরণীয়—যথা ব'দল্যেয়র্‌কে, প্রতিভান্বিত সেই কিশোর র‍্যাবো-কে।

মধুসূদন অন্তত সেকালেই ইওরোপের উপমা তাঁর স্বভাবের প্রাবল্যে পাণ করে নিঃশেষ করেছিলেন। কিন্তু তিনিও একালের আমাদের বদলেয়র ভক্তদের মতোই পশ্চিমা বুনিয়াদি খৃষ্টধর্মের মর্ম আয়ত্তে পাননি, বাঁড়ুজ্জে মশায়রা বা লালবিহারী দে যা খুঁজেছিলেন। মাইকেলের ধর্মান্তর খানিকটা নিতান্তই পার্থিব কারণে, বিলাত যাবার সুযোগ রচনা করতে। তবে হ্যাঁ, মাদ্রাজ অবধি যাবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তারপরে সেই বাইব্‌ল-বর্ণিত উড়নচণ্ডী ছেলের মতো মধুসূদনের নিজবাসভূমে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল নিশ্চয়ই নানা কারণে। হাওয়াতেই তখন শুরু হয়েছিল বাংলায় ফিরে আসার ধ্বনি। শাহেবমন্য মাইকেল নিজেই কবিত্বের দুর্মর গরজে ইংরেজিপনার মূলত ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে ঘরে ফিরলেন, বাংলানাটক লিখলেন বেলগাছিয়া বাঙালি নাট্যপ্রচেষ্টার জন্য।

আমাদের বাংলাদেশের পূর্ব প্রতিবেশে এইরকম একটা শাহেবিয়ানা, ইস্‌লামিকবাদ, উর্দুবাদের ঝড় চলেছিল কিছুকাল ধরে, টমাস মানের ডকটর ফাউস্টুসে যার অনুরূপ উচ্চজীবনমানী জর্মান্ নর্ডিক্ শ্রেষ্ঠতার উন্মাদ এক পর্বের বিরাট ভয়ঙ্কর ট্রাজেডির শিল্পরূপ অসামান্য তীব্রতা পেয়েছিল। বাংলাতেও তারপরে এল ভয়ানক সাম্প্রতিক ইতিহাসের

ন্ত্রণা, যে রাজনীতির ইতিহাস বাস্তবতা পাচ্ছিল বাংলায় স্বদেশ-আত্মার প্রত্যাবর্তনে। অবশ্য মধুসূদনের মানসে এর মুখ্য কারণ কবিত্বের আবেগই, সেই মনের তীব্রতা এবং ইওরোপীয় সংস্কৃতিতে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি থেকেই তাঁর পুত্রোচিত প্রত্যাবর্তন তাঁর ইংরেজি তথা অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় ও সাহিত্যে জ্ঞানের স্বাচ্ছন্দ্য আজকেও বিস্ময়কর। কিন্তু—অথবা সেই জন্যই তিনি বুঝলেন যে ইংরেজিতে—মাই ডিআর ফেলো! যতই আশ্চর্য চিঠি লেখা যাক, সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং জ্ঞানার্জনের চৈতন্যগভীর মৌলিকতায় দরকার রক্তের স্নায়ুর চেনা ভাষার শব্দ ও ধ্বনিছন্দ। রাজনারায়ণ-কে তিনি সাধে লিখেছিলেন :

আমার কোনো ধারণাই ছিল না, মাই ডিআর ফেলো, যে আমাদের মাতৃভাষা এত অফুরন্ত ঐশ্বর্যের যোগান দেবে, আর তুমি তো জানোই আমি খুব একটা পণ্ডিতব্যক্তিও নই। ভাব ভাবনা আর চিত্রপ্রতীকগুলোই শব্দগুলো নিজেরাই এনে দেয়, যে সব শব্দ আমার অজানা ছিল নাও, বোঝো এই রহস্যটা।

রহস্যই বটে। এবং আজও এই রহস্য মৃতপ্রায় বাংলার ভাষায় জীবন্ত :

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি।) অবহেলা করি
পরধনলোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কিন্তু—যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!—একথা তিনি শুনলে

পালিলাম, আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।—এবং এই মাতৃভাষার

ঐশ্বর্যময় শব্দ ব্যবহারের রীতি তিনি যদিও স্বভাবতই ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত করেন, আশ্চর্য লাগে ভাষার যেটা অন্তরঙ্গতম রূপ অর্থাৎ ধ্বনি বা কথনবাচনের মৌলিক ছন্দ, সেই গভীর দেশজ ঘনিষ্ঠতায় মধুসূদন প্রায় প্রথম থেকেই নিশ্চিত।—বাঙালির মনে মাই ডিআর ফেলো, বাংলাভাষার এই রহস্য!

মাইকেলের কাছে পরবর্তী বাংলা কাব্য যথেষ্ট মনোযোগীপাঠ নেয় নি। এ কথাটা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও মানতেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পদ্যে মাইকেলের পরে একটা ঝোঁক দেখা যায় গোটা লয়-পর্বের বা স্ট্রফির সামগ্রিকতা ছেড়ে একটা বিচ্ছিন্ন লাইনসর্বস্বতার দিকে এবং তার ফলে একটা সিংসং অথবা কাব্যি-কাব্যি দীর্ঘস্বর-তার দিকে, ভাস্কর্যের চিত্রান্বিত সংহতি ছেড়ে সরল

রেখার খণ্ডতায়। অপরপক্ষে, অথবা ঐ সরলরেখার প্রতিক্রিয়াতে কণ্ঠে
প্রাবল্য ছড়িয়ে ভাবোন্মাদ নাটকীয়তায়। তাই মাইকেল-পরবর্তী বাংলা পদ্যে
ও আবৃত্তি-যান্ত্রিক পদ্যপাঠের রীতিতে সচরাচর স্ট্রফিক ভাবসংহতির সেই
দীর্ঘায়িত সৌন্দর্য ও অর্থবহতা হারিয়ে যায়, যা ইংরেজি কাব্যে মাইকেলের
পয়ারের বা অমিত্রাক্ষরের মতো আমাদেরও মুগ্ধ করে এবং যে পদ্যবন্ধ ও
কাব্য-বিস্তারের আততি সংপদ্যের হাতের পায়ের বলিষ্ঠতায় একটি
অপরিহার্য গুণ। তাই মাইকেলের বাংলা শ্রবণ-রুচি প্রখর হয়েছিল বড়-র
মতো ছোট ছোট শব্দের প্রয়োগেও, কারণ একটি বিপ্রযুক্ত শব্দই সমস্ত পর্বের
ধ্বনিতরঙ্গ ব্যাহত করতে পারে। এবং বাংলা পদ্য তো সেইজন্যই স্পষ্টত গীতপ্রবণ
ছিল, এমন কি সর্ববাহন পয়ারেও। কিন্তু ঐ সুর-ক'রে-পড়া পরবর্তী কালের
অস্বাভাবিক টেনে-টেনে পড়া বা ফাটিয়ে পড়ার ধরন থেকে জাতে ভিন্ন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে মধুসূদনের বাংলায় কান এত অভ্রান্ত, যাঁর কবিত্ব
তাঁর জীবনের ও শিক্ষার এত বাধা ভেঙে পাহাড়ে নদীর বেগবত্তায় প্রকাশ
পেল, তাঁর কাব্যের কাহিনী-বিস্তারে কেন অসমতা? সে কি ঐ প্রেরণার
মূলে কৈশোর যৌবনের শিক্ষাদীক্ষার বিপত্তির জন্যই, যার ফলে পার্বত্য নদীর
স্রোত প্রেরণায় আঁকাবাঁকা, পাথরে বালিতে এই ডুবজল আর এই চড়া?
তাই কি মেঘনাদবধ বাদ দিলেও ছোট ছোট অঙ্গনা-কবিতাতেও এই
প্রেরণার অস্থিরতা দেখা যায়? অথচ মাইকেলের কবিতার মার্জনাকার্যে
বারবার প্রমাণিত তাঁর জাগ্রত কাব্যিক শুভবুদ্ধি। সে কি তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপের
আকৈশোর দ্বন্দ্ব বা ভাঙনের জন্য, যা রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই অতিক্রম করেন?

মাইকেলের এই অসমতার কারণনির্দেশের চেষ্টা শেষ অবধি পাঠককে
কবিতার বাইরে নিয়ে যায়। কেন তাঁর খণ্ডব্যক্তিত্ব ও খণ্ডকল্পনা প্রবল
কাব্যাবেগ ও প্রতিভা সত্ত্বেও সংকল্পনায় সংগঠিত হয় না, ফ্যান্সি হয়ে ওঠে
না ইম্যাজিনেশন, সে বিচারে দায়িত্ব নিশ্চয় কবির একলার নয়, তৎকালীন
বঙ্গসমাজও, তাঁর যুগও এর জন্য দায়ী। ভঙ্গিলতার এই ব্যাপক কারণেই
বোধহয় মাইকেলের প্রবল ব্যক্তিত্বের ও কবিত্বের ক্রমোৎকর্ষে ব্যক্তিস্বরূপের
আভাসদীপ্ত সেই বিকাশ-মর্যাদা নেই, যা আমরা পাই বিশ পঁচিশ বছর ধ'রে
ওআর্ডসওআর্থে, বা পাই রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ত পরম্পরায় মহিমাময় সংকট
ও ক্রান্তির বিকাশে। কিন্তু মাইকেল যে ব্যক্তিস্বরূপ ও কবিত্বের প্রমাণ
তাঁর বীরত্বমূলক প্রয়াসে শুরুতেই দাখিল করেন, সে কবিমানসিক শক্তিমত্তা

প্রতিকূল অবস্থায় যেন মাত্র বহিরঙ্গ-জয়েই নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তাঁর কবিতার অলংকরণস্বভাব বিকল্পনা বা ফ্যান্সিতেই চমকদার হয়ে রইল। আর এটা যে শুধুমাত্র তাঁর ধ্রুপদীরূপের উৎসাহবশত হয়, তাও নয়। মিলটনও মধুসূদনের তুলনায় ব্যক্তিস্বরূপকে ধর্মনীতি রাজনীতি আদি উৎসাহের সাহায্যে মুক্ত করেন অনেক বেশি। অধিকন্তু, তাঁর কবিতাবলিতে মাইকেলকে ঠিক ধ্রুপদীও বলা যায় না। তিনি তা বুঝতেন, তাঁর সাধ ছিল মিলটনের মতো লেখা, কিন্তু ইংরেজি বিপ্লবের মহাকবির তুল্য হতে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রও বিদ্রোহী কবি পারেন নি। Many say it licks Kalidasa—এই তাঁর সান্ত্বনা ছিল। কন্‌সীটের দিক থেকে কথাটা বেশ, যদিচ সংস্কৃত কালিদাস সংকেতিত মার্গে লিখলেও তাঁর সংগঠনও উত্তরণ ভাবলে মাইকেলের আত্মপ্রসাদটা অর্ধসত্যমাত্র। অবশ্য মিলটনের অহম্‌সম্পর্ক পিওরিট্যান্‌ সমগ্রতার ব্রত মাইকেলের পক্ষে আয়ত্তে আনা আমাদের ঐতিহাসিক সামাজিক কারণেই সম্ভব ছিল না; যখন হুতোম প্যাচারা কোটরস্থ আর ঘরে ঘরে আলালদের দুলাল, তখন কোথায় সেই স্বর্ণঈগল গর্ব, যার জোরে মিলটনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল স্বদেশের তথা নব্য ইওরোপের স্বাধীনতা আন্দোলনে কর্মিষ্ঠ পক্ষগ্রহণ এবং বাণীমূর্তিদান?

পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা-বাসিনীর এই পুস্তকের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে মধুসূদনেরই চতুর্দশপদী কবিতাটি: ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে:

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ অলঙ্কার তুমি যে তা জানি পূর্ববঙ্গে।

এবং কিবা পশ্চিম কিবা পূর্ব, বঙ্গেই তো মাইকেলের উৎসভূমি, কলকাতার খৃষ্টীয় সমাধিস্থলে যার খোদাই স্বীকৃতি:

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রারত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ি কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

বাংলা ফিল্মের পরিণত রূপ, আমাদের জীবন ও 'মেঘে ঢাকা তারা'

বোধহয় যন্ত্রের স্রষ্টা নয় বলে এবং তাই কর্তৃত্বে এখনও আনাড়ি বলেই আমাদের ফিল্ম শিল্প অন্যান্য শিল্প ব্যাপারের তুলনায় তেমন পরিণত তৃপ্তি দেয় না। অথচ জীবনের তাগিদ এবং আনুষঙ্গিক শিল্পগত চাপের হাওয়ায় আমাদের ফিল্মের উপরে বেশ কিছুকাল ধরে একটা বয়স্ক বুদ্ধি ও রুচিজ্ঞানের দাবি প্রভাব বিস্তার করছে। সত্যজিৎ রায় প্রমুখ সচেষ্ট শিল্পীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার শুভ ফল আমরা এরই মধ্যে পেয়েছি, 'অপরাজিত' বা 'পরশ পাথর'-এর মতো ফিল্ম দশ বছর আগে ভাবাই যেত না। এই শুভ ফলের অভ্যাসবশেই আমাদের প্রত্যাশাও বাড়ছে, আমরা এমন ফিল্ম চাই, যাতে জীবন-বেদনা ও শিল্পোৎকর্ষ একতা পাবে একটি মননে এবং দর্শক-শ্রোতার পরিতৃপ্তি হবে সম্পূর্ণতার বোধে সমৃদ্ধ।

ঋত্বিক ঘটকের নতুন ফিল্ম 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে সেই রকম তৃপ্তি পেলুম যাতে মন আমাদের জীবনের করুণরূপে অভিভূত হয়ে যায়, এবং শিল্পের সংবেদন থেকে উৎসারিত একযোগে পরিগ্রহণ ও প্রতিবাদে তীব্র শুদ্ধি লাভ করে। পণ্ডিতেরা একেই বোধহয় ট্রাজেডির স্বরূপ বলেন। এই শুদ্ধিই বোধহয় সবচেয়ে উচ্চস্তরের শিল্পরচনার মাহাত্ম্য, যখন শিল্পরূপায়ণের মধ্যে দিয়ে একাত্ম হয়ে যায় শিল্পীর এবং দর্শকশ্রোতার জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনের পুরুষার্থ। শিল্পরূপের জাত হিসাবে নানা টেকনিকগত কারণে ফিল্মেই বোধহয় মনের এ অবগাহন সবচেয়ে দুর্লভ। তাই 'মেঘে ঢাকা তারা' দেখে আমাদের তৃপ্তি বিস্মিত গভীরতা লাভ করে। অবশ্য বাংলা ফিল্মে কিছুকাল ধরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মননের ও শিল্পীর ধ্যান ধারণার সততা ও সচেষ্টতা।

'অযান্ত্রিক' নামক ফিল্মেই দেখা গিয়েছিল ঋত্বিক ঘটকের জীবনদর্শনের তীব্রতা, যে তীব্র শিল্পমানসের প্রকাশে মোটা এবং সূক্ষ্ম ব্যাপার শিল্পকার্যে বিচ্ছিন্ন থাকে না, যেমন থাকে না বাস্তব-জীবনে। তাই জীবনের শ্রমনির্ভর দারিদ্র্য, নিসর্গ, সৌন্দর্য, প্রেম—যন্ত্রের বিষয়ে মানবিক প্রেম সব একাকার হয়ে

রূপ পায় ছবির স্রোতে। 'অযান্ত্রিক'-এ যা ছিল খণ্ডকাব্যের আবশ্যিক আকস্মিকতায় হোঁচট খেয়ে অসম্পূর্ণ, সেই কাব্যশক্তিই দেখলুম ঋত্বিককুমার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন এই নতুন ফিল্মে।

অনেকেই যা বলেছেন গল্পটি কিছু অসাধারণ নয়, অর্থাৎ কাহিনীটিতে কিছু চমকপ্রদ নেই; প্রায় চেনা জীবনযাত্রার চেনামার্গের রূপায়ণ মাত্র। পরিচালক যে আমাদের সমাজের অত্যন্ত চেনা দুঃখের-সুখের জীবনকাহিনী বাছাই করেছেন, তার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে এই পরিচালক ও তাঁর সহকর্মীরা শিল্পতত্ত্বের ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত মামুলিপনা একেবারে ত্যাগ করেছেন। শিল্প-সংবেদনের একমাত্র উচ্চস্তরের সমগ্রতায় আর চিত্তশুদ্ধিতেই সম্ভব শিল্প রচনার এই অকৃপণ দরাজ সাহসিকতা। মহৎ শিল্পরচনাতেই মেলে তথাকথিত ঈসথেটিক বা সৌন্দর্যতাত্ত্বিক বিচারকে শুচিবায়ুগ্রস্ত নীরক্তভায় পর্যবসিত না করে ব্যাপ্ত সমবেদনায় এবং প্রখর মননের বিস্তৃত বাহুবন্ধনে সচলসবাক্ জীবনেরই মতো রূপায়ণে ধরার স্বাভাবিক সাহস। বাংলাদেশের জীবনে ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে যে ঘটনা সবচেয়ে বড় নির্মম সত্য, সেই গভীর ও ব্যাপ্ত সত্যটি 'মেঘে ঢাকা তারা'-র আকাশভূমি। দেশবিভাগ এবং বহু লক্ষ জীবনের উন্মূলতার ভয়াবহ যন্ত্রণা তীক্ষ্ণতায় যেমন বিস্তৃত তেমনি তার প্রভাবও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মর্মে মর্মে গভীর। এই উন্মূল উদ্বাস্তু জীবন আরো ব্যথাময় বীভৎস হয়ে উঠেছে অর্থসঙ্কটে, যার জন্যে সুখীসচ্ছল গৃহস্থ অনেকেই দিল্লী অঞ্চলের পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের কথা বলে তুলনায় ঢের বেশি অসহায় বাঙালীদের প্রায় গঞ্জনা দিয়ে থাকেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'-র জগৎ হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত গৃহবিচ্যুত দেশবিতাড়িত পরিবারের অর্থাভাবের দৈনন্দিন জগৎ। যে কোন পরিচালকের পক্ষে এই কাহিনী গ্রহণ করতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক হত, কারণ এ জগৎ এক হিসাবে নির্বিশেষ অর্থাৎ সামাজিক সুখ-দুঃখের জগৎ; যে জগতে আবার ব্যক্তিদের, নায়কনায়িকাদের সুখদুঃখ প্রতিফলিত হয় প্রত্যহের ক্লান্তিকর বিন্যাসে। কিন্তু মহৎ শিল্পীর কাছে এই জীবনের বাস্তবতা অর্থাৎ সত্য,—হয়ে ওঠে শিল্পের মানবিক প্রকাশের বিকাশেরই আকুল আহ্বান এবং তাঁর জাগ্রত সুকুমার সংবেদনে ঐ তথাকথিত একঘেয়ে বিন্যাসেই স্পষ্ট তীক্ষ্ণ সুরে ফুটে ওঠে মানবিক বৈচিত্র্যে, মানুষে মানুষে সংলগ্ন কিন্তু স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার রূপে রূপে। প্রকৃত বিদ্রোহী বা বিপ্লবী মেজাজ তার ভিত্তি পায় একরকম

ক্লাসিক মানসে, একটা ধ্রুপদী দৃঢ়তায়, যে দৃঢ়তা আবেগকে দূরে ভাসায় না আবেগপ্রবণতায় অভিযুক্ত হবার ভয়ে, সামান্যকে বর্জন করে না অসামান্যের মরীচিকায়। তাই তার শিল্পরূপের মধ্যে যে অখণ্ডতা আসে তা বাস্তব জীবনেরই অখণ্ডতা, সজাগ সমর্থ শিল্পীর মনে আধৃত। জীবনের চেনা-কে শিল্পের প্রক্রিয়ায় আবার চেনানোর কৃতিত্ব কম কথা নয়, এবং আমাদের শিল্পগত আনন্দ এ প্রক্রিয়ায় গভীরতর হয়ে ওঠে।

'মেঘে ঢাকা তারা'-য় পরিচালকের সামগ্রিক সজাগ বুদ্ধি, চোখকানের সতর্ক সংবেদ্যতা তাই অবাক করে দেয় খুশিতে। তাঁর দলটিও দেখা গেল জমেছে ভালো, মোটামুটি এই একাত্ম শিল্পমানসের নিষ্ঠায় ও সংহতিতে। ক্যামেরার কাজের দক্ষতা ও ইঙ্গিতময়তা ও স্পষ্টতায় গোটা রচনাকে বেঁধে রাখে, যেমন বেঁধে রাখে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সহযোগিতা। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক উচ্চারণ ও ভাষা ব্যবহারের ছন্দ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যও খুব ভালো এসেছে। জায়গায় জায়গায় হয়তো অভিনয়ে কিছু আতিশয্য হয়েছে, যেমন স্বামীজি দৃশ্যে তারণ কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ছত্রধর চলনের একটু মাত্রাধিক্য। কিন্তু মোটামুটি এ চরিত্রের অভিনয়ে আশ্চর্য কৃতিত্ব। মা, শঙ্কর, এমনকি ছোট ভাই, শেষটায় প্রায় মৌন মণ্টু—এদের সকলের অভিনয়ই নিঃসংশয়ে স্পষ্ট। এবং নায়িকার দীর্ঘ ও বিচিত্র পরিবর্তনময় অভিনয়ের আবেদন শক্তিমত্তায় একেবারে অবাক করে দেয়। সচরাচর ফিল্মে নায়ক-নায়িকার মুখ বা শরীর প্রবল আবেগের তির্যকভঙ্গে দেখানোর সাহস পরিচালকদের মধ্যে দেখা যায় না। এবং নামকরা অভিনেত্রীরাও শিল্পের এই নির্মম দাবির কাছে আত্মদান করতে পারেন না, প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যের বা আবেদনের ধারণাবশত। 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকার অভিনয়ের অন্তরঙ্গ আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা তাই এত আশ্চর্যকরভাবে খুশি করে।

ফিল্মটিতে ত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, পরিচালক নিজে এবং তাঁর সহকর্মীরাই সে বিষয়ে আলাপে পঞ্চমুখ হতে পারেন। আমাদের পক্ষে তা অসৎ হবে, কারণ যে সম্পূর্ণ শিল্পরচনার তৃপ্তি আমরা পাই সে তৃপ্তিতে ছোটখাট ত্রুটির সন্ধানটা হয়ে থাকে কষ্ট-কল্পিত। তাছাড়া, শিল্পসমালোচকের দৃষ্টিতে বিপজ্জনকও হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ এই ফিল্মে দেখলুম একটা সম্পূর্ণতা এসেছে শুধু জীবনদর্শনের বা শিল্পরচনার সামগ্রিকতার মধ্যে দিয়েই নয়, সেই সামগ্রিকতা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংস্থান পেয়েছে সমস্ত ফিল্মটির মধ্য দিয়ে, যেমন

পায় কোনো দীর্ঘায়িত গোটা সঙ্গীতরচনায়, রাগরূপায়ণে অথবা সিমফনির রূপায়ণে সহিষ্ণু অংশে অংশে সংহতি নির্মাণে। অথবা জানা একটা বড় উপমা দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করি : শেক্সপীয়রের নাটকে অসতর্ক ত্বরিত অনেক দুর্বলতা অনেক ত্রুটি পণ্ডিত ব্যক্তিরা সহজেই খুঁজে পান, কিন্তু শুদ্ধ পাঠের মধ্যে বা অভিনয় করতে গেলে বোঝা যায় যে, সমগ্র নাট্যের ব্যঞ্জনা বা অর্থের দিক থেকে প্রতিটি ছোটোখাটো ব্যাপারই সংলগ্নতার অর্থ পেয়ে যায় গোটা নাটকটিতে। ধরা যাক সর্বপরিচিত হ্যামলেট নাটক,—রাজার প্রেত সেখানে তিনবার আসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এমনকি প্রেতের প্রস্থানও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ধরুন, প্রথম আবির্ভাব এবং বিদায়, তখন রাত্রি শেষ হয় প্রভাতের পুণ্য রক্তরাগে। কিন্তু দ্বিতীয় বিদায়ের আনুষঙ্গিক বর্ণনায় রাত্রির উপরেই ঝোঁক পড়ে, সূর্য নয়, জোনাকি পোকায়। অথবা একালের লেখাও ধরা যায়, যেমন বের্টোল্ট বেখটের তিন পয়সার অপেরা বা সেৎজুয়ানের ভালো মেয়ে নামক নাটক, যেখানে জীবনাগ্রহ ও শিল্পশক্তি উভয়ত মিলে লেখককে নির্ভীক অবলীলায় পার করে দেয় পাঙ্‌ক্তেয় অপাঙ্‌ক্তেয় দ্বিধা-বিচারের উপরে।

যে কোনো একটা দীর্ঘস্থায়ী শিল্পরচনাতেই এই সংলগ্ন সামগ্রিকতার প্রশ্ন ওঠে, সংযোজনার দীর্ঘ মননে ও গ্রন্থিবন্ধনেই এই মিশ্রজটিল কিন্তু স্পষ্টত এক অখণ্ডতায় দীর্ঘঋজু শারীরিকতা বা শক্তিমত্তা পায় তার নন্দনময়তা। তাই যা হয়তো একজায়গায় মনে হয় একটু বেশি লম্বা বা একঘেয়ে বা অপ্রয়োজনী, তার সার্থকতা পরে স্পষ্ট হয় সংযোজিত বিন্যাসের পর্দায় প্রতিসাম্য পেয়ে বা পুনরাবৃত্তিতেই! সঙ্গীতে এটা প্রাথমিক ব্যাপার, এতেই কম্পোজিশন বা সংযোজনা শরীর পায়। এইরকম চোখের দৃশ্যের বা কথার সুরের পুনর্ধ্বনি বা প্রতিসাম্য অথবা পাল্টা সংস্থান 'মেঘে ঢাকা তারা'তে দেখলুম শিল্পের সেই সাঙ্গীতিক ইঙ্গিতময়তা এনেছে যা শুধু মহৎ শিল্প-রচনাতেই পাওয়া যায়। এই সঙ্গিতচারিত্র্যে চিত্রকল্প হয়ে ওঠে প্রতীক, সরল সাধারণ কাহিনী হয়ে ওঠে গল্পের উপরে চেনা বাস্তবজীবনের প্রায় এক উচ্ছ্রিত রূপকমূর্তি। এই সঙ্গীতচারিত্র্যে সম্ভব হয় পূর্বোক্ত সেই পরম তৃপ্তি, যে তৃপ্তিতে নিদারুণ সত্যের বাস্তব রূপায়ণের ধাপে ধাপে আমাদের একাধারে জীবনবোধ ও শিল্পসংবেদন আবেগে আবেগে বন্যায় স্নাত মননসর্বস্ব এক শুদ্ধিতে বিরিক্ত নিছক মানবিক শুভবুদ্ধিতে গৌরবান্বিত বোধ করে সমগ্রের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে।

ঋত্বিক ঘটককে অভিনন্দিত করি তাঁর সঙ্গীত-পরিচালক নির্বাচনে। সচরাচর ফিল্মে দেখি সঙ্গীত প্রযুক্ত হয় মনোহরণের উদ্দেশ্যে বা বড় জোর অতিরিক্ত অলঙ্করণের প্রয়োজনে, অর্থাৎ সঙ্গীতযোজনা থেকে যায় বহিরঙ্গ। মেঘে ঢাকা তারা-য় দেখলুম শুনলুম ক্যামেরা এবং যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীত চলে প্রাণময় বা অর্গানিক সম্বন্ধের একতায়, কে যে কার প্রাণ সে জিজ্ঞাসা তাই মনেই ওঠে না। এমনকি আগের পাহাড়ের সুর অথবা শেষের মানবীর কান্না অথবা ক্ষয় রোগীর কাশির দমক আর তারপরেই গানের ভেঙে পড়া চমক অথবা সাঙ্গীতিক সংযোজনের অশেষ ব্যঞ্জনা পায় নিঃসংশয়ভাবে। বস্তুত নিছক কণ্ঠের ব্যবহার, তন্ত্রীর ব্যবহার, তবলার স্নায়ু তরঙ্গিত লহরা, চাবুকের শব্দাভাস, রেলগাড়ির তিনদফা কেটে যাওয়া ধ্বনিরেখা, সত্যপীরের পাঁচালি, এমনকি পাখির ডাক—এ সবেতেই জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অভিনব শিল্পপ্রতিভা দেখালেন। তেমনি রাগসঙ্গীতের বেসুর থেকে সুর, লোকসঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রবল অভিব্যক্তি উন্মোচন, এ সবেতেই সঙ্গীত-পরিচালকের বিচিত্রজ্ঞান ও প্রয়োগক্ষমতা অভিভূত করে দেয় এবং নমস্কার জানাতে ইচ্ছা হয় এই গুণীর প্রতি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধায়।

ঋত্বিক ঘটকের, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের, দীনেন গুপ্ত বা সুপ্রিয়া চৌধুরী ও অন্যান্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জাগ্রত মনের প্রয়োগের উদাহরণ তন্ন তন্ন করে দেখাবার চেষ্টা করছি না, কারণ চোখকানের সাক্ষাৎ আবেদন ছাড়া সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ সুকুমার কৃতিত্ব উপলব্ধি করা শক্ত। সামনে দেখলে বোঝা যায় কেন মনে হয় সুপ্রিয়া চৌধুরীর কান্নার তরঙ্গ আমাদের স্নায়ু মন্থিত করে দিয়ে যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সাঙ্গীতিক ধ্যানরূপের সমে বিষমে মানবোৎ-সারিত সমাজজীবনে ও বিশ্বব্যাপ্ত প্রকৃতির সংলগ্ন অর্থময়তায়। এই স্থাপত্যের সংলগ্ন ঐক্যে শিলায়িত হয়ে ওঠে অভিনয়ের অনেকগুলি উচ্চাবচ মুহূর্ত উল্লসিত বা মর্মাহত আবেগের ভাস্কর্যে, বিশেষ করে সুপ্রিয়া চৌধুরী বা বিজন ভট্টাচার্যের চেহারায় বা বাচনে। এইটুকু নিশ্চয়ই বলা যায় যে সঙ্গীতের সামগ্রিকতার এরকম দরদী সজাগ প্রয়োগ নাকি সৃষ্টিই—অসামান্য রুচিজ্ঞান, সুরের ও কণ্ঠযন্ত্রের ও নিছক ধ্বনির কর্তৃত্ব আমাদের ফিল্ম জগতে অভাবনীয় কীর্তি।

নবান্নর পঁচিশ বছর ও নাট্য আন্দোলন

"তিনি তাঁর দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে যে জিবীবিষা আর মৃত্যুভয়ের উত্তপ্ত সত্য তাই যেন হাতুড়ি-নেহাইতে পিটিয়ে গঠন দিলেন নাটকের দৃশ্যপরম্পরায়, অভিনয়ের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বিস্তারের বিবরণ থেকে থেকে উপস্থিত করে—মস্কোতে ঠিক যেমন ভাবে থেকে থেকে খবর আসছিল পার্টিসান্ দলের গৌরবান্বিত কীর্তিকলাপের, চাপায়েভ ও তাঁর সেনাবাহিনীর। আবেগের এমন তীব্রতা তড়িৎচালিত হল থিয়েটারের নাট্যকর্মের মধ্য দিয়ে যে নাটকটি হয়ে উঠল একটি জীবময় বস্তু, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটা লড়াই, যেন নাট্য-গৃহে যে দর্শকেরা বসে সেই মানুষদেরই জীবন-মৃত্যু। তাদের কাছে নাট্যাভিনয়ই হয়ে উঠল আশু কাজের উদ্দীপিত ডাক, বক্তৃতারই মতো, হাতে হাতে পুস্তিকা বিলির মতো বা খবরের কাগজের জরুরী সংবাদের মতো......"

কিন্তু ঐ কথাগুলির প্রযুক্ত মস্কোতে মায়ারহোল্ডের থিয়েটার প্রসঙ্গে—বিপ্লবের পরে।

যদি—হ্যাঁ, আমরা বলাবলি করতুম, যদি শুধু অবস্থা ব্যবস্থাটা পাল্‌টে যেত, নাট্যান্দোলনের অবস্থাও এবং সামাজিক জলবায়ুও! এই মনে হওয়াটাই এক বছর বয়সের ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘের পক্ষে প্রশস্তিলাভ যে আমাদের মনে এই রকম চিন্তা এল, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ে ব'সে ব'সে, নোংরা ছোট একটা হলের মধ্যে, শোচনীয় একটা মঞ্চের সামনে, তাও অনেক খাতির জমিয়ে গলাকাটা দরে এক সন্ধ্যার জন্যে ভাড়া নিয়ে, চতুর্দিকে আমাদের কলকাতার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক দীন হীন গ্লানির মধ্যে। পরে নয়, বিপ্লবের অনেক আগেই।

দর্শকদের ভিড়, তাঁদের আবগোৎসারিত গভীর উদ্দীপনা, পেশাদার থিয়েটারের বৈরিতা, পুনরভিনয়ের জন্যে নানা লোকের নানা জায়গা থেকে তাগাদা—এ সবই প্রমাণ করে বাংলা নাট্যজগতে আমাদের নাট্যসঙ্ঘের প্রায়বৈপ্লবিক কৃতিত্ব, বিশেষত সঙ্ঘের এই তৃতীয় নাটক নবান্ন-য়। আমরা আগে কখনও থিয়েটারের শহর কলকাতাতেও দেখি নি শম্ভু মিত্রের মতো এমন স্বাবলম্বী ডিরেকটর ও অভিনেতা-অভিনেত্রী দল, তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টির নিশ্চয়তা, সামগ্রিকতার উপরে এই কর্তৃত্ব, সমস্ত নাট্যপ্রযোজনাটিকে নানা অভাব ও

বিপত্তির মধ্যেও এমন সংহতভাবে দেখার ক্ষমতা অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ ছোটখাটো সব কিছুই, এমন কি অভাবত্রুটিকেও নাট্যেরই কাজে লাগাবার প্রতিভা। দেখিনি বিজন ভট্টাচার্যের মতো একাধারে নাটকরচয়িতা তথা-প্রযোজক এবং প্রচণ্ড অভিনেতা। এবং মুখ্যগৌণ অভিনেতা-অভিনেত্রীর কুশীলবও ছিল বিস্তৃত, সবাই স্বেচ্ছাকর্মী কিন্তু আশ্চর্য তাঁদের স্বভাবোৎসারিত সাযুজ্যের যৌথ মেজাজ, যা ব্যবসায়ী থিয়েটারে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পুস্তকাকারে নবান্ন-কে বলতে হয় একটি নাটকীয় ইতিবৃত্ত, বাংলার একটা ভয়াবহ নাটকীয়তায় মর্মভেদী সময়ের ১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলন থেকে তেতাল্লিশের শেষ অবধি, অত্যাচার ও তার প্রতিবাদ, এবং তার শাস্তিতে আরো অত্যাচার, জবাবে মাটিতে ফসলে আগুন লাগানো, খাদ্যাভাব, বন্যা রোগ, গৃহহীনতা—একটার পরে একটা। এদিকে তখন অনেক স্বাধীন ভূখণ্ডে চলেছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বিরাট সোভিয়েত যুদ্ধ। নাট্যমঞ্চে তাই বইটি হয়ে ওঠে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ একটি গাঢ়বদ্ধ একাগ্র প্রতীক—এমনই মাহাত্ম্য আন্তরিক নাট্যপ্রযোজনার, যেখানে শারীরিকতার সংবেদন হয়ে ওঠে দৃশ্য ও শ্রাব্য এক একাধারে মর্মবিদারক ও হৃদয়-তাপসঞ্চারী শিল্পবিন্যাস, বৈপ্লবিক এক শিল্পরূপায়ণ যা আবস্ট্রাক্ট-মগ্ন মায়ারহোল্ডের প্রশংসা পেত,—আবার অভিনয়ের বাস্তবতার জন্যে পেত স্তানিসলাভস্কিরও তারিফ।

শম্ভু মিত্র সমস্ত রচনাটির মূল সুর বেঁধে দিলেন খুব সরল উপায়ে, সামান্য সাজসরঞ্জামের সাহায্যে এবং বিবিক্ত ইতিবৃত্তটি পেয়ে গেল শিল্পকর্মের সমগ্রতা। একেবারে প্রথম দৃশ্যের চমকপ্রদ বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল মাত্র এবং প্রবল উদ্দীপ্তির মাত্রা দর্শকদের মনের তার চড়া পর্দায় বেঁধে দেয় এবং তখনই মন প্রস্তুত হয়ে যায় সমস্ত নাটকটির বিন্যাসের জন্যে। তারপরে উচ্চগ্রাম ভেঙে পড়ে ঘোর দুর্যোগে আহত এক গাঁয়ের সংসারে। বিজনবাবুর চূড়ান্ত অভিনয়ে আমরা দেখি গর্বিত আবেগে উদ্বেলিত বৃদ্ধ কর্তাকে, দেখি দুটি ভাইপোকে, তাদের তরুণী বৌদের, ক্ষুধার্ত শিশুকে, দেখি আত্মস্থ শান্তমতি গ্রামের মোড়লকে, অভিনয়ার্থে কঠিন চরিত্র কিন্তু শম্ভুবাবুর শক্তিমত্তায় উত্তীর্ণ। সকলেরই মুখের সামনে অনাহার ও গৃহহীনতা, আর চতুর্দিকে মৃত্যু, অপঘাত, অনাচার। থেকে থেকে নেপথ্যে শবযাত্রার চীৎকার প্রযোজনার তীব্রতা ও রূপাঙ্গিক সচেতন চারিত্র্য আরো চড়া করে তোলে। খুবই সঙ্গতভাবে, কারণ নাটকের গঠন একটা জটিলতা, এমন কি উদ্‌ভ্রান্তিকরতা সমেত বাস্তবজীবনের টাইপ-সত্যের

খুঁটিনাটিতে ভর্তি এবং ভাষা ও বাচন প্রাণবন্ত দেশজরীতিতে বিন্যস্ত, রূপায়ণে তীক্ষ্ণান্বিত, মাত্রায় উচ্চকিত এবং তা মোটেই ক্যারিকেচরের অতিশয়োক্তিতে নয়, আবেগের প্রাবল্যে আপাতশিথিল কাঠামোর সঙ্গে এক সুরে অঙ্গীভূত। তাই প্রথাসিদ্ধ বা টিপিকল সুদখোর উপস্থিত যে কোনো টাটকা জমির দিকে শকুনচক্ষু হেনে—চাষ করতে নয়, মালিকানার লোভে, কেনাবেচা করতে। তার সঙ্গে হাত মেলায় জনগণের আরেক শত্রু, শহরের চোরাআড়তদার, যার গুপ্তকারবার শুধু ধানচালের পাহাড় বানিয়ে নয়, যে আবার গ্রামছাড়া অসহায় মেয়েদের নিয়েও কারবার করে।

গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে গ্রাম। মধ্যযুগের মৃত্যু থেকে আধুনিক অপঘাত। নিছক খাদ্যের প্রশ্ন, সভ্যতার কটি মৌলিক মূল্যবোধ, ক্ষুধার মধ্যেও ও নিবারণ ব্যবস্থার মধ্যেও মানবিক ভব্যতা, জীবন ও মৃত্যু—দর্শকদের যতই সাময়িকভাবে হোক তড়িৎ স্পর্শেই রূপান্তরিত করে তোলে এবং দর্শকেরা হয়ে ওঠে সেই সব মানুষ যারা শুধু ব্যাখ্যা করে না, যাদের মনে হয় যে তারাও বাস্তবের চেহারা পাল্‌টে দিতে পারে।

জর্জী মায়ারহোল্ড বলতেন যে, নাট্যশালায় বাস্তব সত্য জেগে ওঠে মঞ্চে নয় শ্রোতাদের দর্শকদের মনেও। তাই শম্ভুবাবুর সাফল্য অর্জিত হল রিক্ত চটের পশ্চাৎপটে এবং মঞ্চে সরাসরি উপস্থিত করে কলকাতায় যে মানুষকে অপমানকর তখনকার সব লঙ্গরখানা, সরঞ্জামহীন দুস্থ-সেবার হাসপাতাল, অমানুষিক আড়ি-পাতা ক্যামেরা-হাতে সংবাদসেবী, বিট বা দালাল, কালো-বাজারি, বিয়েবাড়ির সেই ভোজ, ওদিকে বাইরে রাস্তার মোড়ে আঁস্তাকুড়ে বাস্তুহারা ভিক্ষুকদের। এই সব কিছুই আমাদের চোখকানকে ধাক্কা দিয়ে যায় আর আমাদের হৃদয়বৃত্তিকে ধাওয়া করে, মনে গেঁথে বসে। আর এটা কাউণ্টারপয়েণ্ডেড বা প্রতিস্বরিত হয় খাঁটি দেশজ ভাষায় যখন মনে করায় যে এইসব ভিক্ষুকাবস্থ মানুষেরা শুধুমাত্র হতভাগ্য গ্রামের লোক, যারা ঘরদোর ছেড়ে এসেছে নিছক খাদ্যের সন্ধানে, যারা মোটেই শহরের ভিক্ষুক-ব্যবসায়ের হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ এদের মাটিতে কাজ এদের স্বভাবের ছাঁচ গড়েছে। পরিণামে এরাও সবাই জমিতে ফিরে যায় এবং সম্মিলিত হয় মরিয়া আনন্দে বাংলাদেশ সাবেক কিন্তু বাস্তবে দুর্লভ সেই মিলিত চাষে, ও ফসল কাটায় গাতায়। নাটকটি শেষ হয় এক চিত্র রচনায়, সকালের প্রথম আলোয় লাঠিহাতে গ্রামবাসীদের নৃত্যে এবং

উন্মাদ বৃদ্ধ প্রবীণ জোড় বাঁধেন সেই স্থিতধী গ্রাম-বৃদ্ধটিরই সঙ্গে—সমস্ত দৃশ্যটি প্রতিপূরক হয় প্রথম দৃশ্যের সেই অগ্নিময় রাত্রির সঙ্গে।

বলাই বাহুল্য, যথারীতি শোনা গেছে বিরূপ মন্তব্য, বিরুদ্ধ সমালোচনাও, প্রায়ই মূল বিবেচ্যটির দিকে মন না দিয়ে—এমনকি পরিচয়-পত্রেও। বস্তুত, নাটকটির প্রবল সার্থকতা সম্ভব হয় নাট্যকার-প্রযোজক-অভিনেতাদের ও সকলের অসামান্য একাত্মতায় এবং সেটা ভারতীয় নাট্যশালায় এক অগ্রণী কৃতিত্ব, যার কথাটা সোভিয়েত দেশের গুণীজনেরা বলেন: একটা বিশেষ আবেদন জাগাতে হলে, প্রযোজককে জানতেই হবে শুধু তাঁর নাট্যদলকে নয়, তাঁর দর্শক-শ্রোতাদেরও, জানতে হবে এবং সৃজনশীলভাবে সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রয়োগ করতে হবে। শম্ভুবাবুরা বিজনবাবুরা তাঁদের শ্রোতৃপক্ষকে জানতেন—আমাদের বন্দী ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যতটা গভীরভাবে জানা সম্ভব। সোভিয়েত অভিজ্ঞতার পাঠ থেকে এটাও তাঁরা জানতেন যে, নাট্যাভিনয় শুধু পরিচিত চালু অনুষঙ্গে নির্ভর করে না, নব নব দৈবপলব্ধিতে মননের শক্তিও তাতে সৃষ্ট হয়, মানুষের আত্মসচেতনতাকে নাট্য নবজীবন দেয়, মানুষের অনুষঙ্গ ও সংলগ্নতার ক্ষমতা জাগিয়ে তোলে।

ঐরকম সব ভাবনা মাথায় এসেছিল বছর-পঁচিশ আগে। 'নবান্ন'—নাটকের প্রযোজনা মনে এমনই ধাক্কা দিয়েছিল, আবেগের প্রবল শক্তিমত্তায় যে আজও সেই অভিজ্ঞতার রৌদ্রে বন্যায় আমাদের মন স্বতই ফিরে যায়, শিল্পের অভিজ্ঞতার এমনই ক্ষমতা। নান্দনিক অভিজ্ঞতা এইরকমই প্রবল হয় যখন আর্ট নন্দনশিল্প এবং যথার্থ জীবনের আবেগময় উপলব্ধি, আমাদেরই, এই মানব-জীবনেরই উপলব্ধি, তার ভয়াবহতায়, তার কারুণ্যে এবং আশ্চর্য তার মহিমাগৌরবে একাকার হয়ে যায়। যেমন বাস্তব জীবনে ও ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় মুহূর্তবিশেষে সাগরোত্থিত হয় নীলকণ্ঠ-বিষ ও অমৃত—যথা ৪৭-এর ১৪ই ১৫ই আগস্ট মনে করুন, তেমনি শিল্পকর্মেও সমুত্থিত হয় এইরকম মুহূর্ত। 'নবান্ন' আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি মুহূর্তকে আধৃত করেছিল নাটকের ভাষায়, নাট্যরূপে, আমাদের ৪২। ৪৩-এর সেই বেদনাকম্প্র জীবনায়নের সঙ্গে একাত্ম অভিনয়ের কর্তৃত্বে ও আবেগে।

সব সময়ে হয়তো নাটকের রচনা বা প্রযোজনা আর অভিনয় যতই

দক্ষ হোক, এরকম প্রবল শক্তিমত্তা ও একতার বোধ জাগাতে পারে না। সম্ভবত শিল্পাতিরিক্ত কিছু বিবেচ্য তথা বাস্তব ঐতিহাসিক বা সামাজিক পরিস্থিতির মানবিক নাট্য ও সৎ শিল্পস্রষ্টার আন্তরিক কর্মকে প্রভাবিত করে। তার অর্থ এ নয় যে, নবান্ন-র দীর্ঘস্থায়ী মর্মস্পর্শী নন্দনে ও চিত্তশুদ্ধিতে কিছু আপতিক ব্যাপার ছিল। আমাদের চোখ ও কান আমাদের বঞ্চনা করেনি।

রবীন্দ্রনাথের শতবিধ কিন্তু একক প্রতিভার ও কীর্তির পরে বোধহয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক-শিল্পীদের এবং গণনাট্যের প্রগতি আন্দোলনই নানা-রকম কর্মক্ষেত্রে অনেক কিছু সাফল্য অর্জন করে সেই সাত-আট বছর ধরে এবং পরে বৃহত্তর প্রভাব রেখে যায়। গল্পে কবিতায় চিত্রশিল্পে তার ছবি পাওয়া যায় এবং নৃত্যেগানেও। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান, ঝঞ্ঝার গান প্রভৃতি সঙ্গীত সৃষ্টি আজও আলোড়ন তোলে এবং নাটকে ও নাট্যমঞ্চে আজ এক দিশারী জয়স্তম্ভ। আর নাট্যরচনাতেই তো লেখক সোজা সেতুবন্ধন করতে পারেন জনসাধারণের মনের সঙ্গে।

কিন্তু নাট্যপ্রযোজনার প্রাণবন্ত আন্দোলন ছাড়া নাটক লেখকের হাত-পা অনেকটাই বাঁধা থেকে যায়। বাস্তবিকপক্ষে প্রাণবন্ত নাট্যসাহিত্যে নাট্যশালাই হয়ে ওঠে নাটকের প্রাণ, তাই নাট্যমঞ্চের আন্দোলনে সাহায্য পান নাটক-লেখকেরা কি গদ্যে কি পদ্যে। এইরকম একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বাংলায় আমাদের শতভাঙনধরা সামাজিক জাতীয় জীবন সত্ত্বেও। শুধু কলকাতাতেই তো কোন্ না ১০-১৫টি নাট্যদল আছে, যাঁদের নাট্যপ্রয়াস প্রায়ই চমকপ্রদ এবং মাঝে মাঝে গভীরভাবে তৃপ্তিকরও বটে। বহুরূপী ও শম্ভু মিত্র যে প্রযোজনার মান অর্জন করেছেন, তা কলকাতার গর্বের বিষয়। তেমনি আছেন নান্দীকার ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত ও তাঁর রূপকার গোষ্ঠী, বিজন ভট্টাচার্যও অসাধারণ বীরত্বে পূর্ণ তাঁর নানা রচনা প্রযোজনা। এখন বোধহয় আশা করাটা পাগলামি হবে না যে, ব্যবসায়ী থিয়েটার ও বুদ্ধিমান থিয়েটারের শিল্পকৃতিত্বের ও আর্থিক নিশ্চিতির অভাবের তফাতটা কমে আসবে। মিলিত নাট্যসংস্থার চেষ্টা তো সেই আশার দিকেই তাকিয়ে।

ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য শৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলীতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলীর অনেকগুলিতেই। লরেন্স মারা যাবার পরে বই দুটি বেরোয়। প্রবন্ধটিতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনো-যোগ ছিল, তা নিছক সাহিত্যিক মূর্তি পেয়েছিল The Man Who Died-এ। Apocalypse তারই আরো স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য গন্থ ভূমিকা-অলডিংটনের মতো সবাইকে অভিভূত করে। ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কি ছন্দ আনা যায় এবং কি যুক্তির অতীত কাব্যলোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্‌ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করেছে, সেই প্রাণ-শক্তির আভাস এ দুটি বইয়েও ক্ষণে ক্ষণে মেলে—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় এবং প্রবন্ধটি টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটি বই পড়ে আবার মনে হল যে লরেন্স সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও অনুপ্রাণিত রূপদক্ষতাই। লরেন্স ছিলেন* ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, তলস্তয়েরা, থরো-রা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের লেখায় শুধু যে সাহিত্যিক লাভ হয়, তা নয়। লরেন্স বা ব্লেকের মস্তিষ্কাতীত-বাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মত-বাদে যেটুকু অনুকরণীয় সে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধী যে রকম একদেশ-দর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স নিজেকে ঠকান্‌নি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেন নি শুধু তার

The Letters of D. H. Lawrence, Edited by Aldous Huxley.

Apocalypse by D. H. Lawrence—পরিচয়, ১৩৩৯।

মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি সাম্রাজ্যসচ্ছল রোমান্টিক উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অলডস্ হক্স্‌লির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসারিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও হক্স্‌লির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হক্স্‌লি জানেন যে সে ভাবটা একেবারেই কাম্য নয়। তাই শাদা কালোর মতো হক্স্‌লি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলীর ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—হয়তো তাঁর প্রস্তাব কাজে রূপান্তর করা অসম্ভব, হয়তো তাঁর কথায় বা লেখায় এমন কিছু থাকত যা স্পষ্টই ভুল, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আলাপেই ধরা যাক্) আজগুবি। কিন্তু তবু বলা যায় যে তাতে কিছু এসে গেল না। আসল ব্যাপার হচ্ছে লরেন্স নিজে, তাঁর মধ্যে জলন্ত যে প্রাণ তার আগুন, যে আগুনের আভায় তাঁর সব লেখা ভাস্বর।

এবং ডায়েরির থেকে—এ সেই অসামান্য লোক যার জন্য আমার শ্রদ্ধা বা বিস্ময় উচ্ছ্বাসিত। অধিকাংশ বড়ো লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখেছি জাতে তফাৎ লাগে না। কিন্তু এ মানুষটি জাতে ভিন্ন, এর মহত্ব স্বতন্ত্র শ্রেণীর, শুধু মাত্রার তারতম্য নয়। ··· ··কেমন যেন আরেক জগতের লোক, অনেক বেশি সচেতন, সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা গুণীব্যক্তি তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি আবেগের শক্তিধর। এবং যদিচ লরেন্স ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported out of the frontiers of human consciousnes। এই আশ্চর্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই. কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে এবং অনেকাংশ জীবনকে অদ্ভুত করেছে। কারণ লরেন্সের আবেগ ও তার প্রকাশ-ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হক্স্‌লির একথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিস্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়া যে অপেক্ষাকৃত গৌণ, তাও আমি জানি। আবেগে জীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিলো। লরেন্সের মন ছিল হুইট্‌ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন

পৃথিবীতে নূতন ক'রে চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness মৌল ভিন্নতা বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈতভা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলীআলোর অভ্যাসে এই রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উপরি-বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্বোধ্য লাগতে পারে। বিশেষ করেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই অপরত্ব বা otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতাসংস্কারে ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেট্‌কে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স লেখে—

"......but somehow, that which is physic—nonhuman in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent The certain moral scheme is what I object to. In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead. When Marinetti writes : 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet. The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women—then I know what he means. He is stupid, as an artist, for contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman. Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat : it is the inhuman

will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word : but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will). Instead of what she feels according to the human conception ... ...You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropic states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say 'Diamond, what ! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon.) চৈতন্যের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্যের কঠিন অন্যতা otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেগ্রায় ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায় অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। ভুল বোঝার সে সম্ভাবনা লরেন্সও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হক্স্‌লির ভাষায় daimon বা দানো তাঁকে তবু মুক্তি দেয় নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চান্ নি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্নেট্‌কে লিখেছিলেন Sons and Lovers প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স বহু বাধা থাকলেও কখনো অপমান করেন নি, করতে পারেন নি। আর্টিস্ট চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্সকে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব

খুবই বক্তৃতাপ্রবণ, খুবই রুক্ষ। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সজলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্ কার্সওএলকে তিনি যা লেখেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও খাটে—"I think you are the only woman I have met who is so intrirsically detached, so essentially separate and isolated, as to be a real writer or artist or recorder. Your relation with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you, I think. You were never made to meet and mingle, but to remain intact. essentially, whatever your experiences may be."

কিন্তু হক্স্‌লি যে ভাবে মরির ঈশদ নাটকীয় Son of Woman-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সে ভাবে বোধ হয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ির ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স যে হক্স্‌লি হলেও হক্স্‌লির মতো না লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, একথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এসব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্‌ল্-ব্যাখ্যাও আমরা না মানতে পারি। খৃষ্টধর্ম যে মানুষের স্বার্থপরতা ও কর্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে ছেড়ে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে তার প্রতি-বিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এসব তত্ত্ব শিরোধার্য না হয় করলুম। বর্তমান ইওরোপ ছেড়ে ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্যবাধকতা কি? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হক্স্‌লিদের গার্নেটদের বা মোরেল এস্‌কিথ্‌কেই ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি, কেম্‌ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিত-পূজারী রসেল্‌কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গান্ধীর মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল—

মানুষ সব চেয়ে বেশি আবেগে চায় তার প্রাণবন্ত সমগ্রতা এবং তার প্রাণবন্ত একতা, শুধুমাত্র তার নিজের "আত্মা"-র বিচ্ছিন্ন মুক্তি নয়। মানুষ চায় সব প্রথম তার আর প্রধানত শারীরিক পরিপূরণ, যেহেতু এখনই, এক-বারের এবং মাত্র একবারের মতো, সে রক্তমাংসে সত্য এবং শক্তিশালী

তার পক্ষে মহাশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে যে সে জীবন্ত। মানুষের পক্ষে, যেমন ফুল আর পশু আর পাখির পক্ষে পরম জয়জয়কার হল সব চেয়ে উজ্জ্বলভাবে, স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে পূর্ণভাবে জীবন্ময় হওয়া। অজাত আর মৃত যাই জানুক তারা জানতেই পারে না রক্তমাংসে জীবন্ময় হওয়ার সৌন্দর্য, তার বিস্ময়। মৃতেরা তাকিয়ে থাকুক ভবিষ্যতের, পরকালের দিকে। কিন্তু দেহের মধ্যে জীবনের যে মহিমাময় এখানে ও এখন তা আমাদেরই, একমাত্র আমাদেরই, এবং একটি বারের জন্যেই আমাদের। আমাদের আনন্দে নৃত্য করা উচিত যে আমরা জীবিত এবং সশরীর এবং জীবন্ময় শারীরিক বিশ্বেরই অংশ। সূর্যেরই অংশ আমি, যেমন আমার চোখ আমারই অংশ। আমি যে এই পৃথিবীরই অংশ, আমার পা দুটো তা ভালোই জানে, আর আমার রক্তধারা তো সমুদ্রেরই অংশীদার। আমার অন্তরাত্মা জানে যে আমি মানবজাতির অংশ, আমার অন্তরাত্মা তো মহা মানবাত্মারই অংশ, আমার মানস আমার স্বজাতীয় সত্তার অঙ্গ। আমার অহম্-পরিচয়ের গভীরে আমার বংশেরই, পরিবারেরই অংশ। আমার মধ্যে কিছুই নেই যা আমার একার নিজস্ব এবং নির্বিশেষ—আমার মন ছাড়া, এবং আমরা দেখতে পাব যে মনেরও নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই, সেটা শুধু জলধারার উপরে সূর্যের রশ্মিছটা।

কিন্তু একটা বিশেষ ধরনে, যা শরীরী, মানুষের মধ্যে যেটা অমানবিক সেইটাই আমাকে টানে, বস্তাপচা মানবিক দিকটার চেয়ে, যে দিক থেকে চরিত্র (নায়ক-নায়িকারা) কল্পিত হয় কোনো একটা নৈতিক ছকের নিয়মে এবং তাকে দেখানো হয় নির্জলা সদা অভিন্নভাবে। ঐ কোনো একটা নৈতিক ছকেই আমার আপত্তি। টুর্গেনিভে, টলস্টয়ে ও ডস্টয়েভস্কিতে, যে নৈতিক ছকে সব চরিত্রগুলিকে খাপ খাইয়ে দেওয়া হয়—এবং প্রায়শই ঐ ছকটা একই ধাঁচের, সে ছকটি হয় একঘেয়ে, জীর্ণ, নিষ্প্রাণ। মারিনেত্তি যখন লেখেন: একটা ইস্পাতের ফলার কাঠিন্যটাই নিজগুণে সার্থক—তার অণুকণার অজ্ঞান ও অমানুষিক যে মৈত্রীবন্ধনে গোলাগুলি প্রতিহত হয়, তাতেই সার্থক। একটা কাঠ বা লোহার তাপই আমাদের কাছে, মেয়েদের হাসি বা কান্নার চেয়ে বেশি আবেগময়: তখন বুঝি তার কথার অর্থটা। অবশ্য বেচারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় যখন লোহার তাপ আর এক মেয়ের কলহাস্যের মধ্যে প্রতিতুলনা করে। কারণ মেয়েটির হাসি বা কান্নার চেয়ে বেশি আবেগময়, তখন বুদ্ধি তার কথার অর্থটা। অবশ্য

বেচারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, যখন লোহার তাপ আর মেয়ের কল-হাস্যের মধ্যে প্রতিতুলনা করে। কারণ মেয়ের হাসিতে যেটা চিত্তাকর্ষক, সেটা ইস্পাতের অণুকণার বন্ধনের বা উত্তাপে তার ক্রিয়ার সঙ্গে আমাকে মুগ্ধ করে ঐ অমানুষিক ইচ্ছাশক্তিই, বলতে পারো শারীরবৃত্ত বা মারিনেত্তির ভাষায় তার শারীরতত্ত্ব। মেয়েটির মনে কি প্রচলিত অর্থে আবেগ বা ভাব জাগে, তাতে আমি কোনো মূল্য দিই না। কারণ তার মানে দাঁড়ায় যে ঐ ভাবাবেগের একটা অহম আছে। আমার মনোযোগ চায় মেয়েটি কি তাই—সে ঠিক কি, অমানবিকভাবে, শারীরিকভাবে, বস্তুভাবে—কথাটার ব্যবহৃত অর্থে! আমার কাছে বড় হচ্ছে সে প্রাকৃতিক বা ভৌত বা জীব বা ঘটনা হিসাবে কি তাই। অথবা কোনো বৃহত্তর নৈর্ব্যক্তিক সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কি তাই সাধারণ মানবিক ধারণায় সে কি অনুভব করে তা নয়।···আমার উপন্যাসে তুমি চরিত্রগুলির প্রাচীন স্থির অহমের প্রকাশের সন্ধান কোরো না। আরেক অহম-সত্তা আছে, যার ক্রিয়াকর্মে ব্যক্তিকে চেনা-জানা যায় না। এবং যে allotropic—ক্রমরূপান্তরশীল অবস্থানিচয়ের—যা মূলত অপরিবর্তিত একটি এলিমেণ্টের উপাদানে মূলত অপরিবর্তিত কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যেমন হীরা এবং কয়লা একই কার্বনের এক শুদ্ধ মূল বা এলিমেণ্ট। প্রচলিত উপন্যাসে দেখায় হীরারই ইতিহাস—কিন্তু আমি বলব : হীরা! সে কি! এত কার্বন। এবং আমার হতে পারে কয়লা বা ভুশো, আমার মূল বিষয় হচ্ছে কার্বন।

What man most passionately wants is his living wholeness and his living unison, not his own isolate salvation of his "soul". Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is in the flesh and potent. For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. What ever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel of being alive in the flesh. The dead may look after the afterwards. But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time.

We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos. I am part of the sun as my eye is part of me. That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea. My soul knows that I am part of the human race, my soul is an organic part of the great human soul, as my spirit is part of my nation. In my own very self, I am part of my family. There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sun on the surface of water. (পৃ: ২২২ - ৩, Apocalypse).

মার্কসের বস্তুবাদের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধ-স্থাপনের দ্বৈতাদ্বৈতে সার্থক ও প্রাণবন্ত। কিন্তু লরেন্স আবেগের স্রোতে সে চিন্তায় আশ্রয় পান নি। এমন কি রিল্‌কের পক্ষেও যে নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিস্বরূপের সম্বন্ধস্থাপনের মধ্যে মানসের একটা প্রগতিসন্ধান সম্ভব হয়েছিল, তাও লরেন্সে নেই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের কুয়াশার মধ্যে তাঁর প্রাণসূর্যের দীপ্তিই আশ্চর্য ও নমস্য।

রিচার্ডসের কল্পনা

সম্প্রতি এজরা পাউণ্ডের প্রবন্ধ সংগ্রহে তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া পড়ে আশ্চর্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেণ্টামী রিচার্ডস্‌ও যে নভশ্চারী কোলরিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কি আশ্চর্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও থিসিস্‌-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজ সংস্কারও বটে। কোলরিজ কাব্য বলতে শুধু কবিতা বুঝতেন না; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান এ বিশ্বাস তাঁর ছিল; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্য সমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ড চৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তি, একথাও রিচার্ডস মানেন। কিন্তু এই মূর্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা কোলরিজের এ কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ডস বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হলেও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে, এবং কাব্য সে মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবী জারি না করে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়, ধর্মপ্রেমআদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে? না এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্বজ ঐ সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য বৈজ্ঞানিকমন্য নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ডস্‌ পাঠকের কাছে প্রায় সর্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা দাবী করেন, এ বইয়ে তা না কমে বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণ সর্তকতা ও রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থ্যকর। বহুকষ্টসাধ্য স্পষ্টতা বর্তমান বলেই তাঁর; কথায় মতান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য কেম্বিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোলরিজের অনেক বিষয়ে

Coleridge on Imagination: by I. A. Richards.

Poetic Experience—by Dom.Gilby.

মহৈক্য। কোলরিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দুজনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণস্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগ-সাধনার যাত্রাপথ। কোলরিজও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং তিনজনেই—সেণ্ট টমাস অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেননি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোলরিজের মতো ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেই জন্যেই নাকি শেক্‌স্‌পিঅর জেণ্টল্। গিলবি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে, আধুনিক কবিজীবনী লেখার রীতি কোলরিজ দেখেন নি, আর ভেরলেন, বদলেয়র প্রভৃতিও তখন জন্মান নি। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলেছে এবং কেন যে দিব্যজ্ঞানবান কবিতার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়তো একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড—যদিচ তিনি মার্ক্সিস্ট বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধান পান নি।

কোলরিজ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হন নি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিল। এবং আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্মাণ, আর এ জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে সঙ্গে নবমূর্তিলাভে, নব আত্মপ্রকাশে। তার ফলে আসে শুদ্ধ কল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে কোলরিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপ কাব্য হলেও এ অক্ষয় বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা কিছু অভ্যাসজর্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজনসাধনের বাইরে, যা কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ তত্ত্বের লীলা। সেণ্ট টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াশাচ্ছন্ন কোলরিজেরও এ রকম একটা ধারণা ছিল। এ বিজ্ঞান-ছাড়া ঈশ্বরের কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বন্ধ। তিনজনের মিল জীবনযাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোলরিজ ও রিচার্ডস্ তো স্পষ্টত কাব্যকে জীবনযাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধকল্পনার তফাত প্রায় তত্তখানি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত

ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এইখানেই হার্টলিকে ছেড়ে কোল্‌রিজে কান্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতাবানে প্রতিভাশালীতে ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস একটু অসুবিধায় পড়ে একটা যাহোক তাহোক্ প্রাক্-নিয়ন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অমার্ক্সীয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নাই। এখানে রিচার্ডস্ সততা-সহকারে মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু বক্তিবাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা ডিলিরিঅম ও মেনিআ বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না হোক, মাথায় ছিটওয়ালার দলে ফেলে, সে ভুল অবশ্য এ তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হলেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তাক্রিয়া ও সঞ্চয়ী স্মৃতির ঐশ্বর্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের তবে তাতে কল্পনার সভ্য-চেতন অবৈকল্য নেই। সেইজন্যেই কল্পনাবিলাস আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ করে গেছেন গ্রে ও কুলির কবিতা নিয়ে ও ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্ থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন তুলে। সে উপলক্ষে রিচার্ডাস্ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্ বিকল্পনার পর্যায়ে ফেলেন, "টু দি লাইট্ হাউস্" বা "টম্ জোনস্"-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে খণ্ডে কল্পনা কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে বোধের উপর এ ভেদজ্ঞানের ভিত্তি এবং ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তাও শুধু ব্যক্তিবিশেষের মনেই শেষ নয়, তার মেরুদণ্ডরূপে থাকবে সর্ব মানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্ বা পুরুষার্থের জগতে। এ মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার মার্ক্সীয় জটিলতায় রিচার্ডস্ নামেন নি। বলেছেন কল্পনাধিচারে সৌভাগ্যবশত মূল্য-মানদণ্ড না নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্যমানুষ মাত্রেরই কখনো না কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখা শোনা হয়েছে। কিন্তু মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি করলে যে ব্যক্তিনির্বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয় না, সে কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্ চেপে গেছেন—মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য

হয়ে। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে গ্রে এবং কুলি সম্বন্ধে। কোলরিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ডস্ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চনীয় বিজ্ঞান তা বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্ পূর্বে এ বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ করে রেখেছেন। কোলরিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লববহ মাহাত্ম্য দেখেছিল। কোলরিজের সেই নানা কারণে অসম্পূর্ণ তবুও মহান চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্ শব্দার্থের রহস্য ধরবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যদিচ মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না জানলেও আমরা ফস্লের রিচার্ডস গ্রেভস্ এম্প্সনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ, তবুও উপকারেই লাগবে। যথা, সব চেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক্, কথা বা শব্দ সর্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পূর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হর্বার্ট রীডের একটি বচন: কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি দুটি কথায় থাকতে পারে,—উদাহরণ, শেক্স্পিঅরের incarnadine, কীটসের shady sadress, কোলরিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্ঠরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous seas লাল হয়ে ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে কল্পনা-বিকল্পনা প্রয়োগ শিরোধার্য। যেখানে এ মানস ক্রিয়ায় উক্ত কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হ'য়ে ওঠে সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা এই শ্লোকে কথাগুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র:—

Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে—

She looks like sleep—
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধির" বিচার হল রিচার্ডসের আলোচ্য। এ শুভবুদ্ধির অস্তিত্ববিনা কল্পনা হয়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুশকিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে। কোল্‌রিজ বিকল্পনা-বিহারী কূলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখছেন, রিচার্ডস্ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে একৃসচেঞ্জের দর রিচার্ডস্ আজও বাঁধতে পারেন নি, কাজেই নিচু দর উঁচু দর অস্পষ্ট কথাই রইল। কোল্‌রিজের মতে এ শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হয়ে উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওআর। এ বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মেনেছেন কোল্‌রিজকৃত Reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ু-বীণা'র রূপক সবার পরিচিত। বায়ু বীণা নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে মত দুটি রিচার্ডসের কঠিন-শব্দ-সঙ্কুল নব বেশে হচ্ছে এই :—

The mind of the poet at moments, penetrating the film of familiarity and selfish solicitude, gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived। এবং The mind of the poet creates a Nature into which his own feelings, his aspirations and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ মত দুটি যথার্থ-ই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চার রকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ডস্ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানব মনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ এ প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানব মনের লীলাক্ষেত্র। এ লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে সব রূপ গুণ এতে প্রকৃতির উপরে আরোপিত হয়, তারা সব

mythical বা পৌরাণিক। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হলো পৌরাণিকের সীমানির্দেশ। যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা এ অধ্যায়ে খুশি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবন-যাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এই সব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ডস্ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেন নি। কারণ এসব পুরাণেই আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। এদের অনুবর্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়শারীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্ত-সহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তিবিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেক সময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও ভয়ানক করে তোলে। সভ্য সমাজেও তা করে তোলে, যার ফলে জাতিতে জাতিতে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না যায়, তাহলে আমরা তাকে হয়তো বলি ধর্ম কিংবা আদর্শ লীগ্ অব্ নেশনস্। এ সব পুরাণে বিশ্বাস অল্প বিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস তাকেই বলে, যে বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ পূর্ণ বিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত ব'লে বা লেনিন ব'লে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ-আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলে এ বিশ্বাসের জোরে, কেউ হয় ট্রট্স্কি, কেউ পিএর ভিদাল, কেউ শেলি, কেউ ডন্ জুয়ান্। সেইজন্যই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন শুভবুদ্ধির, যে বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশি চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চ। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের পুরাণের প্রধান তফাত হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যস্বীকার্য দাবী নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসঙ্কুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে নাও যেতে পারি, কিন্তু মোটর কারের সামনে থেকে না সরলে হাসপাতালে যেতে হয়। যাঁরা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুশি হবেন। ব্র্যাডলির কথা তুলে জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রিজীয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণজীবী ও ব্যবহারী। কেন, সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য রিচার্ডসে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় Capital পুস্তকে।

যা হোক, কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব।

তাছাড়া তফাতই বেশি। সেন্ট টমাসের বিপুল সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যেই কোল্‌রিজ থেকে রিচার্ডস্‌ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টত কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেন নি। এমন কি মারিতাঁ Art and Scholasticism লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোনো স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকান্‌ব্রতী গিল্‌বি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সহিত পরিচিতি ধরে নেয়। স্থানসংকোচে তাঁর দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞানপ্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের পূর্ণতা। তা না হলে এ তত্ত্বালোচনায় মধ্যে মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হতে হত না। প্রথমত বইএর আরম্ভ ধরা যাক্‌, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—Conceptual নয়, প্রত্যক্ষও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মানবের পক্ষে শ্রেয় ও গভীরতর জ্ঞান, এই ধরে গিল্‌বির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাসকে নিয়েছিল। এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেরই ও ঈশ্বরেই! কোল্‌রিজের মতাবলীর সঙ্গে এ মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌বহুল সেকথা এখানে মনে রাখা ভালো। কোল্‌রিজ হয়তো এবং গিল্‌বি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরাবুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রধনু দেখলে তার ব্যাস-দৈর্ঘ্যের মাপ করতে হয় কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রধনু তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রধনুত্বেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে ফর্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয় জ্ঞানের কারবার।

বলা দরকার যে টমাসকে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ তত্ত্বকে thingism তথা ব্যক্তিসর্বস্ব বলে ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের

কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শরীর। এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোলরিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হয়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিল্‌বি দুটো ছবি এঁকেছেন। সে ছবি দুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাত, কিন্তু সমগ্র ছবি দুটি হল ভিন্ন। স্টর্লিং-কৃত উপায়ে স্নায়ু-সম্পর্কহীন করে হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে হৃদয় শুধু একটি মাংসপিণ্ড যন্ত্র। যা হোক, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞানরাজ্যে সমান মর্যাদা নেই। এসব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস করেছেন। তাঁর শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌বি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আবে ব্রেমঁর প্রার্থনা ও কাব্য তাকে প্রামাণ্য দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্ধেকে মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোনো বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয় নি, পূর্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখ্যাত, বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থ-জ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতই নিচু দরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ডস্ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন কিন্তু পরমার্থ মানেন না। মার্ক্সের সঙ্গে দেখছি ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ এখনও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ডস্ আজও একলা নয়।

পরিচয়—পত্রিকায় প্রথম বছরে লেখা

ক্যাথলিক জাক্ মারিতাঁ একদা এক গাছের কথা লেখেন। সে গাছ নাকি বলেছিল, "আমি শুধু গাছ, আর কিছু নয়; আমি যে ফল ফলাব, সে হবে শুধু ফল। সুতরাং মাটির যোগ আমি রাখব না, মাটি তো গাছ নয় আর এ আবহাওয়া আমি চাই না, এ তো শুধু গাছ-আবহাওয়া নয়, এ তো সারা প্রভাঁস বা তাঁদের জলবায়ু। বাতাস থেকে আমাকে বাঁচাও।"

দীর্ঘকাল ধরে' কাব্যলক্ষ্মীও এই বুলি আওড়াতেন। টি এস্ এলিয়ট্ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে অন্য সুর বলান্, এই তাঁর কৃতিত্ব। কবিত্ব করে বলা যায় যে এবার কাব্যলক্ষ্মী জীবনের সমুদ্র থেকে উঠলেন। উঠলেন বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বধর্মে নিধন ভালো। ফলে দেখি দুর্বল ডে লুইস যে জীবন লেখেন, সে সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত তথাকথিত কম্যুনিস্ট জীবন। তাই এপ্‌স্টন্ ব্রিটিশ মিউসিয়মের বারাণ্ডায় আর মারিয়ান্ মূর জন্তুর বাগানে; অর্থাৎ গাছ একটা না একটা আশ্রয় চায়—হয় শৌখিন গ্রন্থশালায়, নয় জাদুঘরে। কিংবা জীবনের প্রাত্যহিকতায়, নয় কম্যুনিস্ট তত্ত্বের জামাকাপড় প'রে।

মারিতাঁ এক জায়গায় বলেছেন যে শিল্পীকে নিজের শিল্পে মানতে হয় একটা তপস্যার কাঠিন্য, ঋজু ব্রহ্মচর্য এবং তা মানতে গিয়ে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। এই শুচিতা প্রায়ই বার্কার পালন ও রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে নিজের সুখদুঃখ দেহমন নিয়ে, নিজের বিশ্বালোচন নিয়ে নাটুকে আতিশয্য তাঁর কাব্যকে পীড়িত করে। কিন্তু এ ন্যাকামি স্পষ্ট বোঝা যায় প্রথম যৌবনের প্রায় স্বাভাবিক বিকার মাত্র। বিদ্যাপতি এই বিকারই রাধিকা প্রসঙ্গে বর্ণনা করে' গেছেন। এ কথা মনে হয় যে অন্য তিন কবির মতো বার্কার মানবজীবন ও সভ্যতার অলিগলিতে যান নি। যে পথে তিনি তারস্বরে আত্মকীর্তন করছেন, সে পথ বড়ো ঐতিহ্যের চওড়া পথ, সে পথে চলা যায় ও চলার পূর্ণ পরিণতি আছে। বায়রনের নাটুকেপনা—ডন্ জুয়ানের নয়, চাইল্ড্ হ্যারল্ডের, বার্কারের ঘাড়ে চেপে থাকলেও, তাই তাঁর মধ্যে মেজর কবির দূর সম্ভাবনা দেখি। অবশ্য বার্কারের প্রিয় মৃত্যু ও প্রেম এখনো কৈশোরের কল্পনা উন্মাদিত নাটুকে প্রেম ও মৃত্যু। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের সীমা বিষয়ে সজ্ঞান (Narcissus I)।

আর বার্কারের নাটুকেপনা ছাপিয়ে' ওঠে তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তি। এই উচ্ছল প্রাণশক্তি কিছুকাল আগে রয় ক্যাম্পবেলেও পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাম্পবেলের মননমার্গ রোমান্টিক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার হওয়ায় তাঁর কবিপ্রকৃতি ম্যাজেপার ঘোড়দৌড়, ট্রিস্টান্ ডা কুন্‌হা, গোখরো সাপ পোষা ইত্যাদিতেও চমৎকার আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যেই বদ্ধ হল। বার্কারের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, যে ব্যাপক জীবনায়ন ও নিজের সীমাজ্ঞান পাওয়া যায়, তারই জন্যে ভরসা হয় তাঁর ভবিষ্যতে এবং ক্ষমা করা যায় এই রকম দুর্বল অনুকরণ—

Wondering one, Wandering on.
One among stars, gone
For ever from beneath the feet bereft
From your always wandering all is left.

কিন্তু চার পাঁচটি কবিতায় অন্তত বার্কারের সংযম এর চেয়ে ভালো কবিতা ও সম্ভব করেছে। এবং বার্কারের এই কবিতাগুলিতে স্বকীয়তার দীপ্তি আছে। বিশ্বজগৎ বার্কারের মনে বাঁধা সড়কে যায় না। এই মননের স্বকীয়তায় তাঁর হাতে ভাষার নির্বিশেষ কথা হয়ে উঠেছে বিশেষ। তাই হয়তো তাঁর শিল্পের ত্রুটি। তাঁর শিল্প তৈরি কিছু নিয়ে কারবার করতে পারে না, তাঁর শিল্প তাই—নিতান্ত ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে—একটু উচ্ছ্বসিত, primitive। প্রিমিটিভ সম্বন্ধে মারিত্যাঁর বক্তব্য মনে রেখেই বার্কারকে এ নিন্দা করছি।

ডে লুইস্‌কে এ নিন্দায় নন্দিত করা সম্ভব নয়। বার্কারের তপশ্চর্যায় ত্যাজ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে বয়সোচিত চাঞ্চল্য আর ডে লুইসের তপশ্চর্যাই নেই। তাঁর প্রবন্ধের বই পড়ে ও তাঁর গুরু ও বন্ধু অডেনের বিশ্বরূপদর্শনে (The Arts Today) নামক গ্রন্থে জেনেছি যে কাব্য সম্বন্ধে ডে লুইসের বোধ শক্তি কিঞ্চিৎ বাঁধাধরা ও তাঁর বিশ্বলোচন মার্ক্সীয় পথে হাঁটতে গিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরছে।

এই নব রোমান্টিকরা যে শুধু সমাজরাষ্ট্রীয় পরিবর্তন চান, তা নয়, তাঁদের জীবনায়নই সেখানে শেষ। এলিয়টপূর্ব কাব্য সম্বন্ধে আপত্তি হত সে কাব্যের বহুমুখ জীবনকে এই সংক্ষিপ্ত সহজ করাতেই; সে আপত্তি আবার এই বামপন্থী কবিকিশোরদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য! এই ফাঁকি ডে লুইসেই সব চেয়ে সহজে ধরা পড়ে, কারণ তাঁর শিল্প স্থূলগ্রাহ্য। তাই তাঁর এ গুরুতর প্রশ্নের জবাব

দেবারও প্রয়োজন হয় না—Is it your hope, hope's hearth, heart's home, here at the lane's end? বরঞ্চ হপ্‌কিন্‌সের জন্তে দুঃখই হয়। লুইসের যে মনন ক্ষীণ ও জীবনদৃষ্টি ধার করা তার একটা প্রমাণ তাঁর এই হপ্‌কিনস্‌ ও অডেনের কবিতাশিল্পের কাছে ঋণ। তার চেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর নাম-কবিতার শিল্পরীতির অন্তসার শূন্যতা। Yes, why do we all, seeing a Red, feel small?—ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত বাক্য ছাড়া সে কবিতাটি কিপ্‌লিং-নিউবোল্টের ভাষাতেই লেখা। এবারে লুইস্‌ pylon cantilever, kestrel-দের হাত এড়িয়েছেন বটে, কিন্তু অর্কেস্ট্রাকবিতা লেখার মানসিক সম্পদ ও শিল্পক্ষমতা তাঁর এখনো হয় নি। শুধু তাই নয়। এটি পড়ে লুইসের কম্যুনিজ্‌মের ফাঁকি আরো ধরা যায়। তার কারণ এর বহু চর্বিত প্রেম (love) charity নয়, মৈত্রী নয়। তার কারণ এতে সেই বিশেষ নেই, যে বিশেষ কবির কোনো predominating passion থাকলে তাঁর কাব্যকে রাঙিয়ে দেবেই দেবে। তা ছাড়া, এই কম্যুনিজমের জয়গান যখন মানবজীবনের বেড়ার বাইরে একঘেয়ে সুরে চলে, তখন সে কাব্যে কবির বিকাশের সম্ভাবনাই বা কোথায় আর বলিষ্ঠ জীবনানুগত্যই বা কৈ? আর মাত্র জীবনানুগত্যই যে কাব্যের উৎস নয়, সে কথা টমিস্টরাও বলেছেন। লুইসদের এই শৌখিন সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ আশা করি প্রতিক্রিয়া হবে না।

জানি এখানে সামাজিক প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর এলিয়ট তাঁর কবিতায় দিয়েছেন, স্বধর্মানুসারে বিপ্লবীরাও দিয়েছেন। এ সমস্তায় ডে লুইস ও তাঁর সমপন্থীরা গোলকধাঁধায় ঘুরছেন ও ঘুরবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ তাঁরা ভুলে' যান মানবধর্ম এবং তাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ও মর্যাদা কি ও কোথায়। মারিতাঁর ভাষায় তাঁদের দুর্দশার বর্ণনা এই—

And for this reason human production is in its normal state an artisan's production and therefore necessitates a strict individual appropriation. For the artist as such can share nothing in common ; in the line of moral aspirations, there must be a communal use of goods, whereas in the line of production the same goods must be objects of particular ownership. Between the two horns of this antinomy St. Thomas places the social problem.

The instruments of labour,—land, agricultural implements the workshop, the tool—were the instruments of labour of single individuals, adapted for the use of one worker and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason they belonged as a rule, to the producer.

কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত প্যাশন বা টমিস্টদের কথায় habit—তার অভাবে লুইসের কাব্য যেমন দুর্বল, সেই অভ্যাসের জোরেই তেমনি মিস মুর বা এম্‌পসন স্বপ্রতিষ্ঠ। স্বধর্মস্থিত অভ্যাসের জোরেই—কারণ এঁরা কেউই মেজর কবি নন। তাঁদের কবি স্বভাব দুর্বল নয়, কিন্তু সুকুমার, স্বল্পপুষ্ট। কিন্তু শুভবুদ্ধি তাঁদের দিয়েছে সীমাজ্ঞান এবং তাঁদের স্বাভাবিক অভাব ও সার্থক অভ্যাস তাঁদের শিল্প ক্ষমতায় সংহত মূর্তি লাভ করেছে।

অবশ্য যে পাঠক হেনরি জেমস পড়েন নি, ডাল্পিআড ও হুডিব্রাস যার ভালো লাগে নি এবং এমিলি ডিকিন্‌সন্ আর আলিস মেনলের কবিতা যাঁদেরকে অভিভূত করে না, তাঁদের মারিআন্ মুর-কে ভালো লাগবে না। আর মার্ভলের বৈদগ্ধ্য ও রচেস্টারের চিন্তাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য যাঁরা বোঝেন নি তাঁরা এম্‌পসনের সুকুমার বৈজ্ঞানিকমন্য কবিত্বও বুঝবেন না। অবশ্য এঁরা দুজনে সব সময়ে সুর ঠিক রেখেছেন ভাবলে ভুল হবে। তাল কেটেছে মধ্যে মধ্যে, মধ্যে মধ্যে তানও হয়েছে গোলযোগ। কিন্তু কয়েকটি ভাল কবিতা তো পাওয়া গেল আর তা ছাড়া—

The artist who has the habit of art and the quivering hand produces an imperfect work but retains a faultless virtue (Art and Scholasticism).

মিস মুরের দৃষ্টি যেন সারসের মতো—মিস সিট্‌ওএলের কবিতা যেন কাকাতুয়ার আর্তনাদ। স্থির শান্ত তাঁর ভঙ্গী—হঠাৎ দেখি শিকার হয়ে গেছে—কবিতার বিশেষ মূর্তিটি আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি ও ধারালো ঠোঁটে ধরা পড়ে গেছে। দৃষ্টি তাঁর হেনরি জেমসের মতো হডসনের মতো প্রখর, প্রয়োগ ও গতি তাঁর পোপের মতো, বটলরের মতো তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র। অথচ আসন তাঁর সংযত শালীনতায় শ্রীমতী ডিকিন্‌সনের বা মেনলের মতো সুষ্ঠু ও সংহত-আবেগ। মিস মুরের ভাষাও অন্তরঙ্গ স্বকীয়তায় নিজের কাছে সার্থক ও পাঠকের কাছে মূল্যবান। মারিআঁন্যার পরীক্ষা তিনি পেরিয়ে গেছেন—

it is bound fast to an object—any object to be made, certainly not an object of contemplation.

তাঁর, তথা এম্প্‌সনের, তপশ্চর্যা সার্থক সন্দেহ নেই। Selected Poems-এর ভূমিকায় এলিয়ট বলেছেন যে জীবজন্তুর প্রতি বিষয়গত টান দেখে যদি কেউ ভাবে মিস্ মূর trivial, তাহলে বুঝতে হবে তারই মন trivial। নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, আর বাইবলের কাল থেকে জীবজন্তুর বিষয়গত সার্থকতা তো আমরা দেখেই আসছি। কিন্তু এ কথা তো আধুনিক মনস্তত্ত্বে বলে ও সেন্ট টমাস সেকালেই বলেছিলেন যে মানসিক ক্রিয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তু, কোনো কোনো প্রতীক অন্যাপেক্ষা মূল্যবান—যথা ঘ্রাণ-গন্ধের সম্বন্ধে যা মানসিক ক্রিয়া হয়, তার চেয়ে দৃশ্যবর্ণের ক্রিয়া আরো গভীর। আধুনিক কবি হতে হলে পেতে হবে মহাকবির মনের ব্যাপ্তি—এ কথা মিস্ মূরকে বা এম্প্‌সনকে বলা যায়। তাঁরা কবি এবং ভালো কবি; কিন্তু তাঁদের বাস যে জগতে সে জগৎ সীমাবদ্ধ। এখানে আরেকটা উদ্ধৃতি তাই দিয়ে ফেলছি—

For this reason art, as ordered to beauty, never stops,—at all events when its object permits it—at shapes and colours, or at sounds or words, considerd in themselves and 'as things' (they must be so considered to begin with, that is the first condition), but considers them 'also' as making known something other than themselves, that is to say 'as symbols'. And the thing symbolised can be in turn a symbol, and the more charged with symbolism the work of art, the more immense, the richer and higher will be the possibility of joy and beauty. The beauty of a picture or a statue is thus incomparbly richer than the beauty of a carpet, a venetion glass, or an amphora.

কিন্তু এ দুঃখ নিয়ে কাব্য পড়া পণ্ডশ্রম। ইংরেজির মতো সাহিত্যেও তিন জনের বেশি মহাকবি আশা করাই অন্যায়। তাই এম্প্‌সন্ পদার্থ বিদ্যার জ্ঞানকে কাব্যমণ্ডিত করতে পারলেন না বলে দুঃখ না করে রাসায়নিক বিদ্যাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই কৃতজ্ঞ রইলুম। Poems-এর আট নটি কবিতা ও Select Poems-এর ততোধিক যে কোনো পাঠককে তৃপ্ত করবে বলে

আমার বিশ্বাস। আর খুশি করবে মিস মুরের গন্ডের শব্দকে কাব্য মণ্ডনের ও এম্প্‌সনের বৈজ্ঞানিক শব্দকে কাব্যভাষা করার ক্ষমতা দেখে।

কিন্তু এলিয়ট যে মিস্ মুরের লাজুক ও শালীন-স্বভাব আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করে বলেছেন, তার দ্বারা কোনো প্রশংসাই হয় না। এ কুণ্ঠা যদি কোন বাধজ (inhibition) হয়, তো কবি চিকিৎসা করালেই পারতেন। তাছাড়া মিস্ ডিকিন্‌সনেরও তো এই বাধ ছিল, কিন্তু তিনি চিড়িয়াখানার আনাচে কানাচে ঘোরেন নি মিস্ মুর লিখেছেন—

> গভীরতম আবেগ সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে মৌনে
> মৌনে নয়, সংযমে।

তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ কঠিন শাসনের মধ্যেও বহমান দেখেছি। শুধু এই শাসনের গণ্ডী টেনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশেও রেখা টেনেছেন, এই ভয়। এ ভয় এম্প্‌সনের বিষয়ে আরো বেশি, কারণ তাঁর গভীরতা আরো আপাতদৃষ্ট, তাঁর স্বভাব আরো শৌখিন ও খেয়ালী। কিন্তু এঁরা দুজনেই স্বধর্মশীল তাই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ কবি—যা ডে লুইসেরা নন্। মিস্ মুর তাই বলেছেন—

> আমিও এটা অপছন্দ করি : অনেক কিছুই এই আবোল তাবোলের চেয়ে
> মূল্যবান।
> কিন্তু পড়তে গিয়ে, গভীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও, আবিষ্কার করা যায়
> এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা অকৃত্রিমের স্থান।
> ... ...
> তবে বিচার
> ব্যতিরেক একটা করতে হয় বৈকি : যখন আধাকবিদের টানা হেঁচড়ায়
> এসব জিনিস মুখ্য হ'য়ে ওঠে
> তখন ফলটা হয় না কবিতা,
> যতদিন না আমাদের বাণী
> সাধকেরা হচ্ছেন "কল্পনার মাছিমারা কেরাণী",
> দুর্বিনয় এবং তুচ্ছতা ত্যাগ ক'রে নিরীক্ষার জন্তে উপস্থিত
> করছেন কাল্পনিক বাগানে প্রকৃত ব্যাং, ততদিন

আমরা এটা পাব না। ইতিমধ্যে, যদি তুমি একদিন দাবি করো:
কবিতার কাঁচা মালমসলা তার
আকাঁড়া উগ্রতায় আর
অন্যদিকে যদি চাও যা অকৃত্রিম,
তবেই তো তুমি কবিতায় অনুরাগী।

পরিচয় : বৈশাখ ১৩৪৩

Poems—by William Empson (Chatto & Windus)
Poems—by George Barker (Faber & Faber)
Selected Poems—by Marianne Moore ,,
A Time to Dance—by Cecil Day Lewis (Hogarth Press)

(২)

বিদেশী সাহিত্যে প্রবেশ স্বভাবতই আয়াসসাধ্য। প্রবেশ চেষ্টায় আমরা বহু বছর কাটাই কিন্তু ছাড়পত্র শেষে যদিই বা জোটে তো সে শুধু কাছার বাড়িতে বসবার জন্য কারণ অন্দরে যাবার প্রশ্ন আমাদের শিক্ষাকর্তাদের মনেই ওঠে-নি। সেই জন্যে আমাদের পড়তে হয় যে সব কাব্য চয়নিকা, তাতে চলা যায় ইংরেজি কাব্যের একটি মাত্র পাকা সড়কে। সে সড়ক আবার প্রায়ই অজরুচির নির্দেশে হয়ে পড়ে খানাখোন্দল মাত্র। তাই যৌবনরূপ বিষম কালের পরে আমরা আর কবিতা পড়ি না। যদিই বা পড়ি ও পলগ্রেভের সোনালি টাঁকশাল বা কুইলরকুচ্ নামক ভদ্রলোকের অক্সফোর্ড কেতাব পড়ি। অথচ রডডেনড্রন-গুচ্ছের তলায় যে পড়া উচিত The Weekend Book বা The Major ও Minor Pleasures of Life অথবা Come Hither সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

এই পাঠসঙ্কটে অডেনের সৎসাহস একান্ত প্রশংসনীয়। অডেন যে বহু কবিতা সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্যই বিস্ময়কর। সিড্‌শেট্ বা স্কেলটনই যে শুধু এখানে জিহ্বা প্রদর্শন করেছেন, তা নয়, এংলোস্যাক্সন কবিতার অনুবাদ, ক্যারল, ব্রডশীটগাথা, সীশান্টি, প্যারডি, নার্শরি লোক কবিতা ও গান ইত্যাদিও আমাদের ইংরেজি কাব্যের অন্দর মহলে নিয়ে যায়। যে লুইস্ ক্যারল আমাদের স্কুলে কলেজে অজ্ঞাতনাম অথচ ইংরেজি বিজ্ঞানের বা অর্থনীতির বই-এ যাঁর কাব্যাদি থেকে উপমা পাওয়া যায়, তাঁরও বিস্তর প্রলাপ কবিতা অডেন সংগ্রহ করেছেন।

প্যারাডাইজ লস্ট বা এপিসাইকিডিয়নের পেশীবহুলতা বা পক্ষসজ্জার ছাড়াও ইংরেজ কবি-স্বভাবের যে খামখেয়ালী হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনার লীলা আমরা অনেকে বুঝিনে, তার সঙ্গে পরিচয় করানো এ সংগ্রহের একটা বিশেষ কাজ। এবং এ সংগ্রহ পাঠে এ তথ্যও কারো কারো হৃদয়ঙ্গম হতে পারে যে দ্বীপপ্রেম ও সাগরপ্রীতি ইংরেজি কাব্যের নাড়ীতে বইলেও রোমান্টিক নবজাগরণই তার চরম কথা নয় এবং ভিক্টোরিয়া যুগের আদিকালে কতিপয় ইংরেজ মহাপুরুষ আমাদের জন্যে শিক্ষায় যে সীমানির্দেশ করে

দিয়ে গেছেন তা ভ্রান্ত না হোক, সঙ্কীর্ণ বটে। অডেন নিজে অসমান হলেও উৎকৃষ্ট কবি আর এদিকে মাস্টারি করেন। তাই তাঁর বই ইংরেজ বালক ও বয়স্কদের জন্যে সঙ্কলিত হলেও যতদিন না হিন্দি আমাদের রাজভাষা হচ্ছে, ততদিন এই রকম বই স্কুল কলেজে আর বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষালয়ে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। কারণ কাব্যে অডেনদের রুচি আশ্চর্য শুদ্ধ এবং তিনি উঁচ্ কপালে না হওয়ায় বহুধাবিচিত্র।

যে দুটি আপত্তি এ বই সম্বন্ধে হতে পারে, তার একটি প্রায় অর্থহীন—যে কবিতাগুলি অডেন দিয়েছেন সে সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভালো কিন্তু ঐ রকম ভালো কবিতা তো আরো বিস্তর আছে সে সব বাদ কেন? কিন্তু পাঁচ খণ্ডের English poets গোছের বিরাট ব্যাপার ছাড়া এ কথার জবাব হয় না। অবশ্য আরেক কথাও আছে। স্থানাভাবেই বহু কবি বাদ পড়েছেন একথা সত্যি হলে কলিন ফ্রান্সিস বিশেষত ডে লুইস ও স্পেণ্ডর কেন? বন্ধুকৃত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অডেন যে জীবন সম্বন্ধে মতামতের দ্বারা চালিত সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাঁর পক্ষে বক্তব্য এইটুকু যে সংগ্রহণে তাঁর মতামত তাঁর রুচিকে বিকৃত করে নি, করেছে শুধু বর্জনে। এবং বন্ধু-প্রীতি কার না আছে?

তাই সুকুমার রায়ের ছড়াটা মনে পড়লেও অডেনের প্রশংসনীয়তা কমে না। শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই কি বলি না—তুমিও ভালো আমিও ভাল কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাউরুটি আর ঝোলা গুড়?—আর, ডি লা মেয়ারের স্বপ্নালু পলায়ন লিপ্সার চেয়ে হয়ত অডেনের সংস্কারক কর্মঠ ভাবটা অপেক্ষাকৃত পছন্দই করব—প্রথমত এ চালটা নতুন বলে, দ্বিতীয়ত এ চালে ছেলেমানুষিটা আপাতবোধ্য, সুতরাং প্রভাবটা কম বিপজ্জনক।

আর সংস্কারক হলেই যা হয়, কবিতার স্বধর্মগত আবেদন বিড়ম্বিত হয় স্বরের উচ্চতায় ও মতের বাদবিতণ্ডায়। ফলে পাঠকের মনে হয় সন্দেহ, নবদেশের নবস্বাক্ষরিত নবকাব্যের উপদেশ বাণীতে ভক্তি পায় লোপ। এঁদের একজন বলেন যে মার্কস ও ফ্রয়েড আসলে এক, আরেকজন বলেন যে মনস্তত্ত্বের গভীরে ডুবলে সমাজ গঠনের চূড়ারোহণ অসম্ভব। স্পেণ্ডর বলেন যে এমন নরাধমও আছে যে নিজের ছেলে হলে ব্যক্তিগত-ভাবে খুশি হয়। ডে লুইস কিন্তু বলেছেন যে এমন নির্বোধও আছে যে

তাঁর সন্তান জন্মোপলক্ষ্যে লেখা মহাকাব্যটা সমষ্টিবাদের অবতারের স্বাগত-ভাষণ বলে ভেবেছে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলে রবার্টসের দীর্ঘ ভূমিকায় বিস্তর গালভরা শব্দ ও গভীর সুরের ভান থাকা সত্ত্বেও তাঁর রুচি নয়, তাঁর মতামতে কোনো আস্থা থাকে না। হপকিন্‌সকে পছন্দ করা এক কথা আর রবার্টসের উচ্ছ্বাস মানা স্বতন্ত্র। আসলে পার্সন্সের কথা সত্য মনে হয় যে হপকিন্‌স নিতান্তই ভিক্টোরীয় কবি ও তাঁর সমস্যা নেহাত সেই কালের বিশেষ একজন ধর্মিষ্ঠ সংসার-ভীরু নীড়-প্রত্যাশী মঠ-বাসীর; কাজেই সেদিক দিয়ে তিনি মডার্নই নন। আর তাঁর প্রভাবও আসলে এলিয়টের তুলনায় নগণ্য। শেষোক্তের প্রভাব মজ্জায় মজ্জায় ছড়ায় আর হপকিন্‌সের শুধু অলঙ্কারে—অনুপ্রাসাদিতে। রবার্টসের ভালো লাগবার ক্ষমতা অবশ্য অসাধারণ—সুকুমার রায়ের ছড়াটা বোধ হয় রবার্টসের জন্যেই লেখা। রবার্টসের ভালো লাগে সব কবিই, অবশ্য যারা নেহাত জনপ্রিয়, তাদের ছাড়া। কিন্তু হপকিন্‌সকে এই আধুনিকমণ্ডলের ভালো লাগার কারণ আমার বিশ্বাস হপকিন্‌সের কাব্যের কাংস্যকণ্ঠ ও উচ্চস্বর। এবং এই কণ্ঠ ও সুরের সাধনই আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য। বারে বারে লক্ষ্য করেছি এঁদের কবিতায় বাক্যে বাক্যে imperative।

জীবনের প্রয়োজনে কাব্যের মূল্য অবিসম্বাদিত সত্য। রিচার্ডসের সঙ্গে আমিও এক মত। কিন্তু মনোবৃত্তিকে যে শুদ্ধি কাব্য দিতে পারে, সে শুদ্ধি আপাতবোধ্য কর্মঠতা নয় বলেই বিশ্বাস। কাব্যকে খানিকটা মোর্‌-র মতো, ফ্রাইএর মতো ধ্যান ধারণার গোত্রেই ফেলি আমরা অনেকে। এইটুকু বলা যায় যে আজকের দিনে আমরা ক্যাম্বেলের চড়া গলায় তৃপ্তি পাই না—বরং প্রেলুডে খুঁজতে যাই সেই গভীর আনন্দ, যাতে করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো অসতর্ক কবি, অপ্রিয় ব্যক্তিও আত্মীয় হয়ে ওঠেন। সেই জন্যেই এই কবিদের সম্বন্ধে মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ হয় না। এমন কি মনে হয় যার ভাষা হয় উগ্র, গলা হয় কর্কশ, তার গায়ের জোর বা মতের জোর হয়ত কমই। তাই এই সব ভালো ভালো কথাও জোলো বা খেলো লাগে—

> Readers of this strange language,
> We have come at last to a country
> Where light equal, like the shine from snow,
>   strikes all faces,

Here you may wonder
How it was that works, money, interest,
building, could ever hide
The palpable and obvious love of man for man.
Oh comrades, let not those follow after
—The beautiful generation that shall spring
from our sides—

ইত্যাদি

অথবা

You who go out alone, on tandem or on pillion
Down arterial roads riding in April,
Or sad beside lakes where hill-slopes are reflected
Making fire of leaves, your high hopes fallen,
Cyclists and hikers in company, day excursionists,
Refugees from cursed towns and devastated areas ,
Know you seek a new world, a saviour to establish
Long-lost kinship and restore the blood's full establishmen't

অথবা

Comrades to whom our thoughts return,
Brothers for whom our bowels yearn
when words are over ;
Remember that in each direction
Love outsibe our own election
Holds us in unseen connection :
O trust that ever.

স্পেণ্ডর, লুইস্, অডেন্ শুধু নয় তাঁদের অন্যান্য বন্ধুরাও এই একঘেয়ে নাটুকেপনায় দক্ষ, যথা ওয়ার্নার-এর

Now will my mind permit me to linger in the love,
The mother kindness of country among ascending trees
Knowing that love must be liberated by bleeding,
Fearing for my fellows, for the murder of man.

রবার্টস্ অনেক কায়দা করে ওকালতি করেছেন—পাউণ্ড এবং এলিয়ট নাকি য়ুরোপীয়, এঁরা নাকি ইংরেজ। রস্তান্ বা নাট্‌সিজর্জর জর্মান বলেও না হয় বোঝা যেত। এবং এম্প্‌সন্ বৈজ্ঞানিক, তাঁর আবেদন সুতরাং ঐ য়ুরোপীয় বৃদ্ধদের চেয়ে সহজবোধ্য, সর্বজনবোধ্য ও মূল্যবান্। মাত্র দুটি উপাদেয় ছত্র তুলে দেখলেই এম্প্‌সনের সর্বজনবোধ্যতা বোঝা যাবে—

Only have we space ; commonsense in common,
A tribe whose lifeblood is our sacrament,
Physics or metaphysics for your showman,
For my physician in this banishment ?
Too non-Eulclidean predicament.

এবং

Professor Eddington with the same insolence
Called all physics one tautology ;
If you describe things with the right tensors
All law becomes the fact that they can be
described by them ;
This is the Assumption of the description.
The duality of choice thus becomes the
singularity of existence :
The effort of virtue the unconsciousness of
foreknowledge.

রবার্টসের ভূমিকার মতো গভীর-ছল ভ্রান্তিবিলাস সত্ত্বেও—কয়েকজন

প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা দলীয় কারণে বাদ পড়া সত্ত্বেও তাঁর সংগ্রহটিকেই প্রকাশিত বইএর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ও ভালো বলতে হয়। সুখের কথা, এতে কৃতী আমেরিকান্ কবিরাও আছেন এবং জীবিত কবিদের মধ্যে ইয়েট্‌স্ থেকে গ্যাসকয়ন অবধি কবির একসঙ্গে পরিচয় দেওয়া সত্যিই ধন্যবাদার্হ। তা ছাড়া, বাস্তবিক ঐ কয়েকজন সংস্কারক ছাড়া অন্য বিষয়ে রবার্টসের রুচি মোটামুটি নির্ভরণীয়। বিশেষ করে মারিআন্ মুর, ওয়ালেস স্টীভেনস্, রোজেন্‌বর্গ, ওয়েন, র‍্যানসম্, টেট্, ক্রেন, রাইডিং, গ্রেভ্‌স্ ইত্যাদির অনেক কবিতাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগবে। এবং ঐ সংস্কারক কবিদের নানাকারণে নামডাক বেশি হলেও ইংরেজি কবিতার ভবিষ্যৎ যে তাঁদের হাতেই শুধু নেই, এ আশ্বাসও হয় এই সংগ্রহ পাঠে।

আমার পক্ষে অন্তত এ আশ্বাসের প্রয়োজন। স্থানাভাবে এই কবিকিশোরদের কাব্যের নানা বিরক্তিকর কাব্যগত ত্রুটি, অনুকরণ ও মুদ্রাদোষের বিস্তৃত তালিকা না দিয়েও বলতে পারি যে পার্সনসের মতো আমার মতে যাঁরা আত্মসংস্কারে বিশ্বাস করেন তাঁদের কবিতা জাত হিসাবেই বহিঃসংস্কারে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কবিত্বের চেয়ে বড়ো। কারণ আমি মনে করি যে-জীবনে আত্ম জিজ্ঞাসার ছায়া নেই, সে জীবন অসম্পূর্ণ, ছেলেমানুষী। কারণ অসত্যের প্রবল প্রতাপে আমার বিশ্বাস। তাই আমার বিশ্বাস যে মহাকবির কবিতামাত্রেই না হোক, তার কবিদৃষ্টি হবে tragic। তাই কিং লিয়ার স্নায়ুকে ছিন্নভিন্ন করে নিয়ে যায় মানবজীবনের চরম উপলব্ধিতে. তাই জেম্‌সের নভেল প্রিয়পাঠ্য, তাই এই অডেনাদির প্রায়ই চতুর কুশলী কাব্যে এমন লাইন না পেয়ে হতাশ হই—

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear :
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There is a tree swinging
And the voices are
In the wind's singing

More distant and more solemn

Than a fading star.—

আসল কথা পরিবর্তনটা ইস্তাহারে নয়, চাই অভিজ্ঞতার গভীরে।

তাই অডেনের দক্ষতা এবং স্পেণ্ডারের সৌকুমার্য পছন্দ করেও আপাতত খুশি হয়েছি তরুণতর বার্কর, টমাস ইত্যাদির আপাত উদ্ভ্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক মননশীলতায়। আশাকরি বিপ্লবের শুদ্ধিসাধনে ইংরেজি কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক মিলবে জীবন রচনার বহির্মুখের সঙ্গে।

পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪৩

The Poet's Tongue—Edited by W H, Auden & J, T. Garrett (Bell)

The Faber Book of modern Verse— " Michael Roberts (Faber)

The Progress of Poetry— " J. M, Parsons

(Chatto & Windus)

'হিন্দুস্তানের বিদ্রোহ' ও চার্টিস্ট নেতা

ইংলণ্ডের চার্টিস্ট নেতা অর্নেস্ট চার্লস জোন্সের 'হিন্দুস্তানের বিদ্রোহ'* কবিতাটি সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্ম সম্পাদক স্নেহাংশু আচার্য ও মহাদেবপ্রসাদ সাহা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানবেন। জোন্স সাহেব জন্মান মার্ক্সের জন্ম-ভূমিতে ১৮১৯ সালের ২৫শে জানুআরি এবং মারা যান এঙ্গেলসের কর্মক্ষেত্রে ১৮৬৯ সালের ২৬শে জানুআরিতে।

খাস বিলাতে ধাম হওয়া সত্ত্বেও জোন্স তাঁর মানবতার অপরাধে দুবছর জেল খাটেন। সম্পাদকযুগল এই কারাকাহিনী ভূমিকায় লিখেছেন: কিভাবে ১৩ × ৬ ফুট কুঠরিতে তুষারবৃষ্টির ঝাপ্‌টা খেয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল।

জোন্সের কবিতা পড়ে ত্বরিত পাঠকের মনে হতে পারে যে জোন্স মুখ্যত উদারচিত্ত মহান মানুষ ও সমাজসেবক ছিলেন। মনে হতে পারে যে তাঁর কবিতার রূপায়ণ শিথিল, তাঁর কবিতা সমগ্রতায় দানা বাঁধে না। এক রকম মন থাকে যা মানবিকতায় সামগ্রিক সত্তা পায়, সে মনের কাছে মানব-চিন্তা, কর্ম ও কাব্য স্বতন্ত্র থাকে না। জোন্সের কবিতা পড়ে বোধ হল যে তাঁর মন এই রকম সামগ্রিকতার আভাস পেয়েছিল: এই রকম এক বিরাট ও সংহত মনেই মার্ক্স লিখেছিলেন তাঁর 'ক্যাপিটাল' নামক বিরাট ট্রাজিক মহাকাব্য, যদিচ সে কাব্য গদ্যে এবং তার আপাতদৃষ্ট বিষয় টাকা-পয়সা মাত্র।

জোন্সের অবশ্যই ছিল না সেই দেবদুর্লভ মহিমা, যে শক্তি সাহিত্যজগতে একমাত্র দান্তে-শেক্‌স্‌পিঅর-বালজাক-তলস্তয়ের তুল্য। কিন্তু কবিত্ব জোন্সের অবিসম্বাদী। যথোচিত কাব্যরূপের সংগঠনের তাঁর মানসিক সময় ছিল না। তাছাড়া, এরকম মানসের পক্ষে কাব্যরূপায়ণ সে যুগের আবহাওয়ায় মোটেই স্বাভাবিক আনুকূল্য পায়নি। হয়তো আগের শতকের—বা পরের শতকের লোক হলে জোন্স আরো সংহত প্রতিবাদী কবিতা লিখতেন। টেনিসন-ব্রাউনিঙের যুগে কোনো ইংরেজ কবির পক্ষে ভারতীয় বিদ্রোহবিষয়ে কবিতা

---

*The Revolt of Hindostan or The New World by Ernest Jones. Edited with a new introduction by Snehangshu Kanta Acharyya and Mahadev Prasad Saha. Eastern Trading Company, Calcutta. Rs. 3/-

লেখা, যে কবিতার মেজাজ খুবই উঁচু পর্দায় বাঁধা—I saw a new Heaven and a new Earth—ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। এবং সে কবিতায় যদি কাব্যশরীর শিথিল হয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ যে ঐতিহাসিক আবেগপুঞ্জে ও মানসিক ভাবনা-চিন্তায় এই কবিতার নির্ভর, সেগুলি তখন অস্পষ্ট। অধিকন্তু, জোন্‌সের কবিতার সাক্ষাৎ বিষয়টিই ঐতিহাসিকভাবে অপরিণত, অর্থাৎ অস্পষ্ট।

তবু ইংরেজ জোন্‌স যে সিপাহী বিদ্রোহের সুনিহিত রূপটি বা সত্যটি ধরতে পেরেছিলেন, সেটাই তাঁর মানসিক কবিত্বের কৃতিত্ব। কারণ, আজও বিলাত কেন আমাদের দেশেও অনেক ব্যক্তি ভারতের ইংরেজ-দ্রোহকে উপযুক্ত মর্যাদাদানে অক্ষম। তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিন্তায় অগ্রণী, তাঁরাও কেউ কেউ মনে করেন যে সিপাহীবিদ্রোহ যেহেতু নবাবীসূর্যাস্তে লাল হয়ে গিয়েছিল তাই তা প্রতিক্রিয়াশীল মাত্র। অথচ বাদশাহী রাজারাজড়ার সঙ্গে জড়িত হলেও ইংরেজ শাসনের প্রতিবাদটা তখন যথার্থই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। বিদেশী জোন্‌স সে সত্যটা ধরতে পেরেছিলেন, তাই জেনি মার্কস লেখেন যে জোন্‌স was busy making kossuths of all the Hindus. বস্তুত, ইওরোপে আঠারো বা উনিশ শতকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সব বিপ্লব-বিদ্রোহ হয়েছিল, সেসবও সামন্ততান্ত্রিক মানসে কমবেশি মিশ্রিত, আমাদের জাতীয় বিদ্রোহের মতোই। জোন্‌সের সমভাব তাই ভারতীয়দের পক্ষে সহজেই প্রকাশ পায় :

The generals see their scanty legions yield,
But dare not bring the Sepoy to the field.
The council multiply the camp's alarms,
By timid treaties in the face of arms :
They tremble lest the nations, freed from fear,
Should ask "Why came ye thence ?—What do ye here ?"

And in their seas of blood the answer view :
"We murdered millions to enrich the few,"—
And Sepoy soldiers, waking, band by band,
At last remember they've a fatherland !

গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা

সেকালের কথা মনে পড়ে। আমার নবীন বন্ধুদের পক্ষে সেকাল অবশ্য। এক ছোটো চায়ের দোকানে, নামে হয়তো রেস্তোরাঁ, রেস্টুরেন্ট নামেই সাবেকি কলকাতায় খ্যাত; একদিন গরম দুপুরে সেখানে লোহার চেয়ারে বসে আরো ঘেমে ঠাণ্ডা হবার জন্যে চা খাচ্ছি দুজনে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, কবি ও ঔপন্যাসিক এবং আরেকজন এক আরো অল্পবয়স্ক লেখক, অখ্যাত-নামা। দেখা হয়ে গেল আরেক সাহিত্যিকের সঙ্গে, তিনি আমাদের নজরুল ইসলামের বন্ধু, গণজাগরণের পুরোধা কর্মী। মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে সেদিন ছিলেন ঘর্মাক্ত কলেবর এক বলিষ্ঠদেহ বন্ধু, তাঁর নাম ফিলিপ স্প্র্যাট। সাহিত্যের প্রেরণার কথা, দায়িত্বের কথা শুনলুম। অভিভূত হয়েছিলুম সেই চায়ের দোকানে গরমে গরম-জামা-পরা রুগ্নদেহ ভাস্বরপ্রাণের বিনয়-শান্ত কথায়।

বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে এঁরাই বলবার চেষ্টা করেছিলেন বস্তিতে যাদের থাকতে হয় তাদের কথা। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-এর যুগ সেটা। শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত; যুবনাশ্ব, স্থকুমার ভাদুড়ী; এমনকি গোকুল নাগের মতো স্থকুমার ব্রাহ্ম-সামাজিক মানুষও এদিকে মন দিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, সব কিছুই মহৎ সাহিত্য হচ্ছিল না; কিন্তু সাহিত্যিকের নিজের পক্ষে মহাসত্য মা ফলেষু কদাচন; বড় কথা তাঁর সচেতনতা, তাঁর আলস্যহীন ও বিনীত প্রয়াস, তাঁর সাহিত্যিক সততা।

এবং সে গুণ এঁদের কমবেশি ছিল বৈকি, তা না হলে এঁদের গল্পে-উপন্যাসে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এত বিচলিত হবেন কেন তাঁর শৌখিন মার্জিত রুচির দিক থেকে? আর প্রতিক্রিয়াশীল হিঁদুয়ানিই বা ক্ষেপে যাবে কেন মাসের পর মাস অকথ্য গালিগালাজ করতে করতে? অথচ এঁদের শারীরিক ব্যাপারের স্পষ্টভাষিতায় যে মনলৌল্য ও ইঙ্গিততৃপ্তি তা রবীন্দ্রনাথের 'লেবরেটরি' বা 'বাঁশরী'-তে কি একই রূপে টস্‌টস্‌ করছে না? বা উল্টোদিকে, আকাশ থেকে পাতালে তাকালে, নীতিধ্বজদের নিজেদের লেখায়?

বিদ্রোহীদের জয় তখনই হয়ে গেছে কিন্তু। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকেও নতুন জানলা খুলতে হয়েছে। ঐতিহাসিক সে জয়। সাহিত্যে শ্রেণীবিচার উঠে গেল, অন্তত বিষয়ারোপের দিক থেকে, "ছোটলোকেরা" তখন সাহিত্যে ঢুকে পড়েছে, আর তাদের বার করে কে? হয়তো একটু বিকারের ঘোরেই ঢুকেছে, হয়তো সে অধিকার-ঘোষণা কিঞ্চিৎ বেশি ভাববিলাসী অস্বাস্থ্যের দিকেই ঝুঁকেছে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নির্ণয়ের সামাজিক যুগে যেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু ঘোষণাটা লাভই হয়ে রইল। আজ দেখা যায় বিকার অনেকটা কেটেছে আমাদের। বেদে-র ছন্নছাড়া অতিরঞ্জনে তাই বলে কি তেতাল্লিশের কমিউনিস্ট লাইন খুঁজতে যাব?

সেকালে ব্রাত্য-রা ব্যক্তি হয়েই এল, অস্তিত্বহীন সঙ্ঘের অংশ হিসাবে নয়। সে আসার সার্থকতা সাহিত্যে প্রায় প্যারিস কম্যুনের সার্থকতা। উনিশ শো পাঁচের রুশ বিপ্লব বাদ দিয়ে কি ১৯১৭? তা ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পের স্বচ্ছ করুণা, বুদ্ধদেবের বিদ্রোহী রবীন্দ্রবিরোধী আবেগ, শৈলজানন্দের বীরভূমের নিসর্গের মতো ঋজুকঠিন কথকতা, অচিন্ত্যকুমারের ক্লান্তিহীন বিষয়-অনুসন্ধিৎসা ও রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ সবেরই কাছে বাংলা সাহিত্য ঋণী। লুই আরাগঁ ঠিকই বলেছেন, সাহিত্যের ইতিহাস তার টেকনিকেরই ইতিহাস, অতীতের রাজনৈতিক প্যারালেলে তার সংজ্ঞা মেলে না।

অন্তত প্রারম্ভিকে এবং মুখ্যত। তারই নিকষে দেখি আজকে তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মহৎ ও নব নব প্রসার, মনস্তাত্ত্বিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম চিত্রাবলি। কারণ এঁরাও আরম্ভ করেন সেই সেকালে। ব্যক্তিগত খেয়ালের এবং ভেদাভেদের বাইরে যে বৃহত্তর সামাজিক বেদনা এবং সাহিত্যিক চৈতন্য কল্লোল-কালিকলমকে আসলে চালিত করেছিল, সেই বেদনা ও সেই সাহিত্যিক মানসই তাগিদ জুগিয়েছে 'সমুদ্রের স্বাদ'-এর তিক্ত করুণা ও নির্বিকার শিল্পশুদ্ধির, জুগিয়েছে 'পঞ্চগ্রাম' ও 'কালিন্দী'-র কীর্তিময় গঠনের, 'অভিযান' বা 'হাঁসুলিবাঁকে'র গ্রামছাড়া জীবনের ভাঙন ও নবপত্তনের ছবির।

সেকালে যার মিশ্র সূচনা, আজ দেখা যায় তার বহুধা কিন্তু স্পষ্টতর পরিণতি। অবশ্য পরিণতি বলতে বাংলা সাহিত্যের পটে এবং বাংলার জীবনের বাস্তব নিকষেই বিশ্বসাহিত্যের পুরুষার্থে সিদ্ধিলাভ বুঝি। তা

ছাড়া নিজের দেশের সীমায় নিজের সাহিত্য-শ্রদ্ধা না করে নঙর্থক সমালোচনায় রুশ সাহিত্যের তুলনায় সবই নস্যাৎ করা সাহিত্য তথা রাজনীতি দুদিক দিয়েই ভুল।

তাই মানিকবাবুর অস্থির কৌতূহল, জীবনের নানা স্তরের তথ্যজ্ঞান, থেকে থেকে তাঁর গভীর ও সংবেদ্য অন্তর্দৃষ্টির ঝলকানি, সেটাই আমাকে শ্রদ্ধানত করে। তাই তারাশঙ্করবাবুর কাঠামোর ব্যাপ্তি আমাকে অভিভূত করে—এমনকি যখন তিনি জীবনে মশ্‌গুল হয়ে যান, যেমন 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য়, শিল্পের নদীর তীর যখন জীবনের সমুদ্রে ডুবে যায়, তখনও। তাঁর একাধারে প্রসার ও জীবনের সত্যের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবিসত্য লাগে মাইকেল এঞ্জেলোর পাশে জ্যত্তোর মতো গীতিকবিতার স্বর্গচারী সারল্য এবং শরৎচন্দ্র মনে হয় বাঙালি গৃহিণীর মধ্যাহ্ন মনোরঞ্জনে দ্বিপ্রহরের ভোজান্তে পানদোক্‌তার ভাববিলাসী ঘোর। প্রত্যক্ষ জীবন, ভূগোল-ইতিহাসে বিশিষ্ট যে বাস্তব জীবন তারাশঙ্করের প্রতিভায় বাংলা উপন্যাসে তা আগন্তুক। এবং এমনি গভীর তার সংবেদন যে প্রকৃত ভাষা তাঁর হাতে ছন্দের নির্ঝর হয়ে উঠেছে, অধিকন্তু সে সাবলীল ভাষার গতি একতারা নয়, চরিত্রে চরিত্রে—এবং চরিত্র তাঁর জগতে বহু—সে ছন্দ চারিত্র্য পায় সেতারের রাগমেলার মতো। এটা যে কী মূল্যবান কীর্তি, তা য়ুরোপের উপন্যাসের ইতিহাস দেখলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবে; তা ছাড়া সত্যকার ঔপন্যাসিক সার্থকতা তো এইখানেই প্রত্যক্ষ জীবনের স্থানকাল নির্ণীত রূপায়ণে, যে রূপায়ণের চরম প্রাণপরীক্ষা ঐ ছন্দ উৎসারের সততায়। 'অভিযান' হয়তো তারাশঙ্করের 'কবি', 'কালিন্দী' ও 'পঞ্চগ্রামে'র মতো আবশ্যিক মহত্ত্ব দাবি করে না, কিন্তু লেখকের জনপদসতর্ক চোখ ও কান তাঁর গল্পকার ও ঔপন্যাসিক প্রতিভাকে বাস্‌-ড্রাইভারের উষর পথে জেলা থেকে জেলায় অবলীলায় পার করে দিয়েছে।

আমার এক নবীন বন্ধুর মতো আমি উপন্যাস মাত্রেই 'ওআর এণ্ড্‌ পীস্‌'-এর সঙ্গে তুলনার প্রলাপ বকব না, ডস্টএভ্‌স্কি ও শরৎচন্দ্রকে এক আসনে বসাব না, যেমন কবিমাত্রকেই তুলনা করব না শেক্‌সপিয়রের সঙ্গে। কিন্তু এটুকু বলা যায় পণ্ডিত-মূর্খের হঠকারিতা না করেই যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসের জুড়ি য়ুরোপ আমেরিকায় আজ হাতে গোনা যায়—মোরিয়াক, মাল্‌রো, হেমিংওয়ে, স্টাইন্‌বেক্‌, শোলোকভ্‌, লিওনভ্‌? তবু তো

অনেকের মতো তাঁর লেখার প্রাচুর্যে তাঁর সৃষ্টির কাঠামো চাপা পড়ার ভয় থাকে।

মানিকবাবুর বা অচিন্ত্যবাবুর বই পড়তে পড়তেও মনে হয় দেশবিদেশের গল্পকারের কথা। 'পদ্মানদীর মাঝি', 'সহরতলী', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ইত্যাদি উপন্যাসে ও নানা গল্পে মানিকবাবুর যে চমকপ্রদ দক্ষতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি, সে কৃতিত্ব আজ সংহত দৃষ্টিতে সেই নব সম্ভাবনায় ঐশ্বর্যবান, যেখানে জীবনের ব্যাপ্তিতে লেখা হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক, মহৎ।

কিন্তু বিশেষ করে আজ অচিন্ত্যকুমারের কথাই বলছি, কারণ বহুকাল পরে তাঁর লেখা একসঙ্গে পুস্তকাকারে পড়লুম। তাঁর পরিণতির সার্থকতা ঐতিহাসিক তুলনা জাগায় হেমিংওয়ের সঙ্গে। তাঁর ভাষার যে ব্যায়ামীর পেশল অভ্যাস বরাবরই চকিত করত, আজ সেই দৃঢ়বদ্ধ বিন্যাস পেয়েছে তার উপযুক্ত বিষয় এবং তার থেকে পেয়েছে সেই নৈর্ব্যক্তিক পরিমিতি, যা আসে মানবধর্মীর হৃদয়বত্তা থেকেই। হেমিংওয়ের রচনাবলির ভয়াবহ মিতভাষিত্ব, স্বেচ্ছায় বেবাক্ মূর্খের বাক্যের ও শব্দের সীমাবদ্ধতা স্পার্টান্, ল্যাকনিক্ প্রচণ্ডতা পেল ট্রাজেডিসার্থক বিষয়ে, স্পেনের ফ্যাশিস্ট-যুদ্ধে। অনতিকথনের প্রায় সেই সার্থকতা এসেছে অচিন্ত্যবাবুর সাম্প্রাতক গল্পের শব্দসম্পদে, বাংলার গ্রামের মফঃস্বলের মৃত্যু-উদ্‌গারে জীবনের প্রবল নাট্যের ধাক্কায়। সাহেবের মা, বিভা, সরবানু, ইমানদ্দি, ইজ্জত আলি ও সোনাউল্লা, বাহারণ, কাদেম ফকিরের কাফুন-কাপড়-পরা তার বউ—দুর্গত সমাজ-ভাঙা বাংলার, অত্যাচার অনাচারে জর্জর বাংলার বহু মানুষ তাঁর চোখে অস্তিত্ব পেয়েছে করুণায় অবজ্ঞায় ঘৃণায়, ক্রোধে রুদ্ধপ্রায় শাণিত ভাষায়। দেশজ শব্দ তাই বাস্তবের তীক্ষ্ণ মর্যাদা পেয়েছে তাঁর গল্পে। মর্মান্তিক তাঁর হিন্দু ও মুসলমান চাষীর দুর্বহ জীবনচিত্র, মর্মান্তিক তাঁর কথার মোচড়ে মোচড়ে প্রাকৃতজনের কথ্যভাষার আবেদন।

তাঁর ভাষার আততি অচিন্ত্যকুমারকে দিয়েছে সস্তা কারুণ্য থেকে মুক্তি। আবার তাঁর বিষয়ানুগ মানবিকতা তাঁকে দিয়েছে তথাকথিত সহজ মানুষের সুখদুঃখের সহজ সাধারণ রূপ থেকে না পালানোর সাহস। মনে হয় আমাদের এই সব লেখকেরা সিদ্ধির সেই স্তরে পৌঁছেছেন যেখানে সেন্টিমেণ্টালিসমের সহজ অভিযোগ বা ন্যাচারালিসমের অশ্লীলতার নালিশ তাঁদের শিল্পসমাধি তথা জীবনদর্শন ব্যাহত করতে অপারগ।

তাঁর গল্পের জীবন জীবনেরই মতো বিচিত্র, তিক্ত, মধুর, বিস্ময়কর, মিশ্রাবেগ।

তা ছাড়া অচিন্ত্যকুমারের এই* কটি বইয়ের আরেক আকর্ষণ হচ্ছে বাংলার গ্রাম্য মুসলমান জীবন, যা তার মুখ্য পটভূমি। বাস্তবিকই, এত দরদ ও এত তথ্যজ্ঞান দিয়ে ঐ বিশেষ জীবন, যা অবশ্য মূলত বাংলার গরীবেরই জীবন—হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক—কংগ্রেসী বা লীগই হোক—আর কেউ চিত্রিত করেছেন কিনা সমান সাহিত্যিক সার্থকতায়, তা আমি জানি না। অচিন্ত্যবাবুর নিরলস কৌতূহল এবং তা চরিতার্থ করবার সুযোগ গ্রহণ এবং তাঁর অকুণ্ঠ মানবিকতাই তাঁর এই নতুন নির্মাণের সহায়। আর সহায় তাঁর শব্দের বাক্যের ছন্দের নিত্যনব প্রয়োগে শিল্পোৎসাহ।

বেশ কিছুকাল আগে 'বাংলাসাহিত্যে প্রগতি' নামক প্রবন্ধে আমি যে আশা করেছিলুম প্রায় তাই আমার সেকালের চেনা নমস্য এই তিনজন লেখকের লেখায় পেয়ে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আজ সাবালক বাংলা গল্প-উপন্যাসে মুক্তবিহার দেখা যায়—রমেশচন্দ্র সেনের বিস্ময়কর কিন্তু পরিণত লেখায়, জ্যোতির্ময় রায়ের অসামান্য নৈপুণ্যে, ননী ভৌমিকের বিজন ভট্টাচার্যের আশ্বাসে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের করুণকোমল দরদের বিপদ এবং শৈলজানন্দের তীক্ষ্ণ মোপাসাঁ-শোভন কথকতা কি আর পাব না আজকাল?

পুনশ্চ:

সম্প্রতি পড়লুম তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' এবং মানিকের 'চিহ্ন'। ভূগোলের একটি স্থান মুখ্যপাত্র হয়ে ফুটেছে এই উপন্যাসে সেই স্থানমাহাত্ম্যে, যা প্রাণ পায় বিশেষ প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের প্রাকৃতিক জীবনে এবং মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃতির বিশেষ রূপে। জায়গাটার চেহারা যেমন তারাশঙ্করের চোখ ও আমাদেরও চোখ জুড়ে বসেছে, তেমনি মশ্‌গুল করেছে তাঁকে কাহারদের জীবন এবং তাই পাঠকের মনও অবলীলায় পার হয়ে যায় এত বড় উপন্যাস—বরং শেষ করে একটু হতাশই হয়—এই কি শেষ?

হয়তো শেষটা খুব স্বচ্ছ নয়, বিহ্বল শেষ। কিন্তু সে বিহ্বলতা তো

* কাঠখড় কেরোসিন, যতনবিবি, আসমানজমিন, কালোরক্ত

আমাদের জীবনেরই, যুগেরই। তাই এই দুই যুগের মধ্যের বাঁকের গল্পে তিনি নাম দিয়েছেন উপকথা।

'চিহ্ন' পড়ে মানিকবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় বহুগুণ। কলাকৌশলে যে তাঁর পরীক্ষার বিশ্রাম নেই, তার প্রমাণ 'চিহ্ন'। এই সিনেমাশোভন বহু ব্যক্তির জীবনে অবলম্বিত একটি কাহিনী এই রকম সামাজিক রূপ পায়নি ভার্জিনিয়া উল্‌ফে, বা হেনরি গ্রীনের চলন্ত গল্পে। তার কারণ অবশ্যই মানিকবাবুর সামাজিক অবহিতি এবং বাস্তব ঘটনার সুযোগ। বিপ্লবী রোমান্টিক দৃষ্টিতে কলকাতার একটি স্মরণীয় রূপ মূর্তি পেল কলকাতার কয়েকটি মানুষের জীবনের প্রবল আন্দোলনে, স্থির সমকোণে নয়, ঘূর্ণায়মান চক্রে প্রগতিতে। যার সূত্রপাত অক্ষয় চরিত্রে। এমনি সততা মানিক-বাবুর শিল্পীমনের, এমনি পরিমিত তার রোমান্টিক আবেগ যে তাঁর দরদ স্বভাবতই পড়ে এই চরিত্রে, তার মানবিক পরিবর্তনে। সে পরিবর্তনে যে চূড়ান্ত ক্রান্তির চিহ্ন নেই, সেই তাঁর সামাজিক সততার প্রমাণ। ফেব্রুয়ারি জুলাই যে আগস্টে, সেই বর্ষভোগ্য আগস্টই তো মুক্তি পায় আরেক আগস্টে চোদ্দই পনেরোই অভূত আনন্দের চিহ্নে।

[পরিচয়, শারদীয় ১৩৫৪